উৎসর্গ

হোমিওপ্যাথির

পুণ্য-বেদীতলে উৎসর্গীকৃত যাঁর মহৎ জীবন,
পীড়িত-দুর্গতের
কল্যাণ কামনায় সর্বদা নিয়োজিত যাঁর উদার হৃদয়
এবং অধম-সন্তানের
অন্ধকার-চিত্তে দেদীপ্যমান ছিল যাঁর জ্ঞানালোক,—
সেই পরমারাধ্য
পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার পূর্ণেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের
শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম আমার প্রথম
সশ্রদ্ধ-অর্ঘ্য।

প্রণত—
শ্রীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়

দুটি কথা

বাংলাদেশে সাধারণ্যে হোমিওপ্যাথির প্রচার হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু হোমিওপ্যাথদের মধ্যে তার প্রগতি হয়নি তদনুরূপ। বাংলার ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও আজ যেমন হোমিওপ্যাথির আদর হয়েছে, প্রসার হয়েছে, তেমনি শহরগুলিতেও। এই প্রসারতায় সাহায্য করার যে গৌরব, তার অধিকাংশটুকুরই প্রাপ্য হচ্ছে বাংলাভাষার ছোট-বড়-মাঝারি মেটিরিয়া মেডিকাসমূহের। কিন্তু কেমনভাবে যে তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে, কী উপায়ে যে হোমিওপ্যাথির প্রগতি আনাযেতে পারে, সে পথের সন্ধান দেবার মতো কোন পুস্তক বাংলাভাষায় আজও বিরলদৃষ্ট। ঔষধ বাছাই প্রণালী নির্দেশক পুস্তকের অভাব তো আছেই।

রোগীক্ষেত্রে ঔষধ-নির্ণয়ের মূল নিয়মগুলি 'অর্গ্যানন' দেওয়া আছে অবশ্য ; কিন্তু প্রণালীসমূহের বিস্তৃত উল্লেখ নেই সেখানেও। বিভিন্ন মনীষীর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীসমূহ ইংরেজা ভাষার হোমিওপ্যাথিক পুস্তকাবলীতে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ-ভাবে ; কিন্তু একত্র সমাবেশ নেই কোথাও। বাংলাভাষায় তার হদিশ মেলে না পর্যন্ত। অথচ ঔষধ বাছাই প্রণালীর অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনস্বীকার্য। এই অভাবটুকু আমি উপলব্ধি করেছি মর্মে মর্মে এবং অনেক চিকিৎসক বন্ধুদের কাছ থেকেও অভিযোগ পেয়েছি। আমার 'ঔষধ বাছাই প্রণালীটি' হলো তারই সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং উক্ত অভাব দূরীকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। সফলতার দাবী রাখি না, কিন্তু চিকিৎসকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখি এদিকে।

'ঔষধ বাছাই প্রণালী' প্রণয়নে আমি অনেকের কাছেই ঋণী এবং সে ঋণ অপরিশোধ্য। মহাত্মা হ্যানিম্যান, ডাঃ বোনিং-হোসেন, ডাঃ কেণ্ট, ডাঃ ন্যাশ, ডাঃ মিলার, ডাঃ জন উইয়ার, ডাঃ কালী, ডাঃ ঘটক প্রভৃতি প্রথিতযশা চিকিৎসকগণের অমূল্য রচনাবলীর সহায়তা ব্যতীত আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস হতো সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই অবসরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব পূর্বসূরীদের উদ্দেশ্যে।

পরমপূজ্য ৺পিতৃদেবের উৎসাহে এ কাজে প্রথম হাত দিই; তিনিই এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা তাঁরই আশীর্বাদে যখন সফল হলো, তখন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বহু দূরে। আজ তাঁরই আনন্দ হতো সর্বাধিক, কিন্তু তার স্থলে আমার চিত্ত আজ বেদনা-বিধুর।

আমার চিকিৎসা-সংক্রান্ত লেখার হাতে খড়ি হয়েছে 'হ্যানিম্যানে'র পাতায়; এবং 'হ্যানিম্যানে'ই প্রথম প্রকাশিত হয় 'ঔষধ বাছাই প্রণালী'টির কিয়দংশ। আবার, হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ-এর সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এটিকে পুস্তকাকারেও রূপায়িত করা হলো। আমি তাঁর নিকট চির-কৃতজ্ঞ ও চির-স্নেহার্থী। ইতি—

পুরুলিয়া
মহাত্মা ফ্রেডরিক স্যামুয়েল
হ্যানিম্যানের আবির্ভাব দিবস
১০ই এপ্রিল ১৯৫৬ সাল

বিনীত—
গ্রন্থকার

চতুর্থ সংস্করণের কৈফিয়ৎ

বর্তমান সংস্করণটিকে 'সংস্করণ' না বলে 'মুদ্রণ' বলাই সত্য-সঙ্গত। কারণ, এবার সংস্কারকর্মে সময় দিতে পারিনি একেবারেই অথচ, অনেক কিছুই ছিল এতে নতুনভাবে সংযোজনের, কোথাও কোথাও বা পরিমার্জনের। চিকিৎসা-ব্যবসায় কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় এবং হোমিওপ্যাথির পাঁচমিশেলী কাজে বিশেষভাবে যুক্ত থাকায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি থেকে গেল পুস্তকটির পরিমার্জন ক্ষেত্রে, এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি ভাবী পাঠকবর্গের কাছে।

পুস্তকটি সমাদৃত হয়েছে বলেই, সহৃদয় প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থটিকে পুনঃপ্রকাশের জন্য আমায় তাগাদা দেওয়ায় এবং শেষত তিনি নিরুপায় হয়ে এটিকে পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব করায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিলাম!

আশা করছি, চতুর্থ সংস্করণও যদি সমাদৃত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় আরও একবার সংস্করণের সুযোগ পাই তখন পুস্তকটির কায়কলেবর পরিবর্তনে সচেষ্ট হব।

দুর্গাপুর-১৩
রথযাত্রা,
সন ১৩৮২ সাল,
১১ই জুলাই, ১৯৭৫

বিনীত—
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের বক্তব্য

বিজ্ঞানমুখিতা চিকিৎসক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পথ নির্দেশ করে। একজন সাফল্যমণ্ডিত হোমিওপ্যাথ হতে হলে চিকিৎসাক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলির উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনেই এই পুস্তকের পুনঃপ্রকাশ তৃতীয় সংস্করণের ভিতর দিয়ে। বিজ্ঞানমুখী-হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকসমাজ যদি এটিকেও, পূর্ববর্তী সংস্করণ দুটির মতোই গ্রহণ করেন, তবে সাফল্যমণ্ডিত হবে আমার শ্রম।

বর্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব হলো—একটি নতুন অধ্যায় ও পরিশিষ্টভাগ সংযোজন। অধুনাকালে 'রেপার্টরি' পুস্তকের কদর বেড়েছে নিঃসন্দেহে; চিকিৎসকগণের একটি বৃহদংশই 'লক্ষণকোষ' বাঁটছেন, এবং প্রায়শঃই সেটি মহামতি ডাঃ কেন্টের প্রণীত। কিন্তু কেন্টের রেপার্টরি যেমন সুবৃহৎ, তেমনি সুসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, তার ব্যবহার বিধি অনেকেই সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি; অনেকেই পত্রযোগে আমাকে সে ব্যর্থতার কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উত্তর দিলেও, সকলের সংশয় ঘুচাতে পেরেছি কিনা জানি না; তাই বর্তমান সংস্করণে বিস্তারিতভাবে কেন্টের 'রেপার্টরি'র ব্যবহার-কথা আলোচনা করেছি নতুন সংযোজিত অধ্যায়টিতে। আশা করি, কৌতূহলী চিকিৎসকের পক্ষে কেন্টের রেপার্টরি এবার সহজবোধ্য হবে।

পরিশিষ্টভাগে, কয়েকটি রোগী-বিবরণীর পরিচয় দিয়েছি; উদ্দেশ্য এই যে—অঙ্কের ছাত্রের পক্ষে যেমন উদাহরণ সাহায্যে পরবর্তী প্রশ্নাবলীর অনুশীলন করা সহজ হয়, তেমনি ঐ রোগী-বিবরণীগুলিতে

কী ভাবে ঔষধ বাছাই করা হয়েছে তার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা সাহায্যে স্ব স্ব বাস্তবক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ যেন ঔষধ নির্বাচন করতে পারেন তার পথ সুগম করার প্রয়াস পেয়েছি। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিচয় পরিশিষ্টভাগেই সংযোজিত হয়েছে।

অতিরিক্ত বক্তব্য হলো এই যে, বর্তমান সংস্করণ-কর্মে কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও করেছি, যার ফলে সেই সেই অংশগুলি আরও সুপাঠ্য ও সুবোধ্য হয়ে উঠবে।

হোমিওপ্যাথ-মহলে গ্রন্থটির চর্চা উত্তরোত্তর যে-বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ বিজ্ঞানমুখী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-সমাজের সজাগ মনোভাব; এবং এই আশাতেই গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণের আরও অধিকতর প্রচার কামনা করেন।

দুর্গাপুর—১৩
ভিষগাচার্য কেণ্টের আবির্ভাব দিবস
৩১শে মার্চ, ১৮৪৯ স্মরণে
৩১. ১০. ১৯৬৭

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
দুটি কথা	...	...	...	৫
পূর্বাভাষ	...	...	...	১৩
প্রথম অধ্যায়—লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(১)...				১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়—লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(২)...				৩৬
তৃতীয় অধ্যায়—গাণিতিক-পদ্ধতি		...		৫৭
চতুর্থ অধ্যায়—চক্রাবর্ত-প্রণালী—(১)		...		৮৭
পঞ্চম অধ্যায়—চক্রাবর্ত-প্রণালী—(২)		...		৯৯
ষষ্ঠ অধ্যায়—চক্রাবর্ত-প্রণালী—(৩)		...		১০৬
সপ্তম অধ্যায়—সহচর-লক্ষণের নীতি		...		১২৭
অষ্টম অধ্যায়—কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ বাছাই				১৪৭
নবম অধ্যায়—'মারী'-ঔষধতত্ত্ব ...		...		১৬৫
দশম অধ্যায়—প্রজ্ঞা-দর্শন		...	...	১৬৮
পরিশিষ্ট—				
(ক) বি-১ ডাঃ কেন্টের নির্দেশিত লক্ষণসমূহের মূল্যমান তালিকা		...	...	১৭৭
বি-২ ঔষধ বাছাইকরণের কয়েকটি উদাহরণ				১৭৮
বি-৩ হোমিওপ্যাথিক মতে রোগাবলীর বিন্যাস-তালিকা		...	...	১৯১
(খ) লক্ষণ-লিপিকরণের খাতার ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি			...	১৯২
নির্ঘণ্ট	...	...	...	১৯৩

ঔষধ বাছাই প্রণালী

পূর্বাভাষ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল প্রোথিত আছে বিজ্ঞানভূমির উপর, কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে প্রয়োগ-কৌশলের খোলা-হাওয়ায়। চিকিৎসা-বিদ্যা-কল্পদ্রুমের ফলভোগের দ্বারা রোগজীর্ণ পাণ্ডুরদেহ নতুন প্রাণ-শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। রোগীক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে ফল-দেখানো নির্ভর করে হোমিওপ্যাথি-বৃক্ষের সঠিক ফলটি রোগীকে প্রদান করার উপর। চিকিৎসকের কাজই হচ্ছে তাই।

গাছ থেকে ফল পাড়বার জন্য আমরা হয় আঁকশি ব্যবহার করি, নয় গাছ বেয়ে উপর থেকে পেড়ে আনি ; আবার কখনও কখনও বা ঢিল ছুঁড়তেও কসুর করি না। প্রত্যেকটি উপায়েই 'ফল'-লাভ করা যেতে পারে ; কিন্তু সেটি নির্ভর করে, যে ফল পাড়ে, তার দক্ষতার উপর। লক্ষ্য স্থির থাকলে ঢিল ছুঁড়েও কাজ হাসিল করা যায়, আবার পাকা-গাছুড়ে হলে তো কথাই নেই। কিন্তু সবচেয়ে সহজসাধ্য উপায় হচ্ছে আঁকশি ব্যবহার করা। হোমিওপ্যাথিতেও তেমনি সঠিক ঔষধ বাছাই করবার আছে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রণালী। চিকিৎসকের পক্ষে কোথায় কোন্ প্রণালীটি গ্রহণযোগ্য, সেটি নির্ভর করে চিকিৎসকের দক্ষতার উপর এবং কতকটা বা রোগী-বিশেষের ক্ষেত্রানুযায়ী।

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ বাছাই-এর প্রণালী আছে কয়েক প্রকারের। সেই প্রণালীগুলিতে চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা একান্তভাবেই দরকার। কোথায় কোন্ প্রণালীটি হবে সুপ্রযোজ্য, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল হওয়া চাই ; সবক্ষেত্রেই প্রত্যেক প্রণালীই ব্যবহারযোগ্য নয়। যেখানে যার সুবিধা বোঝা যাবে, সেখানেই তার প্রয়োগ অবশ্য-কর্তব্য।

ঔষধ বাছাই প্রণালীর মূল নিয়ম হচ্ছে, রোগের লক্ষণানুযায়ী ঔষধ-লক্ষণের সাদৃশ্য নির্ণয় করা। উক্ত মূল-নিয়মটিকে কেন্দ্র করেই প্রণালীসমূহকে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রণালীসমূহকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তাদের বিশিষ্ট প্রয়োগ-ক্ষেত্রানুযায়ী :—

প্রণালী	প্রয়োগ-ক্ষেত্র
গাণিতিক পদ্ধতি.....	চির রোগে
চক্রাবর্ত-প্রণালী.....	সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস রোগসমূহে
সহচর লক্ষণের নীতি.....	চির রোগে ও অচির রোগে

কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ বাছাই.....প্রধানত, অচির রোগে 'মারী'-ঔষধতত্ত্ব.....মহামারী রোগে।

উক্ত প্রণালীসমূহকে আয়ত্ত করতে হলে চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, প্রথমত রোগী-পর্যবেক্ষণ বিষয়ে এবং দ্বিতীয়ত মেটিরিয়া মেডিকায় ও লক্ষণ-কোষ বা রেপার্টরি ব্যবহারে।

রোগী-পর্যবেক্ষণ-বিষয়ে ডাঃ হ্যানিম্যান যে সমস্ত আলোচনা করেছেন, তা আমাদের মনে রাখতে হবে রোগী-দেখবার সময়। রোগী-দেখার সময় কোন লক্ষণকেই গুরুত্বহীন মনে করা উচিত নয় ;—সামগ্রিক লক্ষণ-সঞ্চয়ই হবে চিকিৎসকের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মেটিরিয়া মেডিকায় ব্যুৎপত্তি-লাভ। ঔষধ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মেটিরিয়া মেডিকা হচ্ছে দিগ্‌দর্শন। মেটিরিয়া মেডিকায় থাকে ঔষধের আত্ম-পরিচয় ;—প্রত্যেকটি চরিত্রগত লক্ষণের সুনির্দিষ্ট পরিচয় মিলে মেটিরিয়া মেডিকাতে। এক ঔষধের সঙ্গে অপরের পার্থক্য কতখানি, তা আমরা জানতে পারি একমাত্র উভয় ঔষধের তুলনামূলক অধ্যয়নের দ্বারা। এক্ষেত্রে মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ ব্যতীত নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়! কিন্তু এ হচ্ছে কম শ্রমের ব্যাপার ; এক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিচারের দ্বারাই আমাদের উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ সম্ভব। সেই কারণে, চিকিৎসক মাত্রেরই তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন মেটিরিয়া মেডিকা কুশলী। আর যাদের তা নেই, তাদের জন্য প্রয়োজন হবে লক্ষণকোষের।

এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে লক্ষণকোষ বলতে কী বোঝায়? তার উত্তরে বলতে হয় যে, লক্ষণকোষ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট-ভাবে সজ্জিত যাবতীয় ভৈষজ্যের লাক্ষণিক-সূচী ; অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ আছে, সেই সমুদয় লক্ষণকে একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে সমাবেশ করে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য কি কি ঔষধ আছে তারই পরিচয় দেবার এক

রকমের অভিধান স্বরূপ। অভিধানে যেমন প্রত্যেকটি শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে, তেমনি লক্ষণকোষের মধ্যেও থাকে প্রত্যেকটি লক্ষণের পরিচয়-বোধক ঔষধাবলী। অভিধানের মতই এদের সাজানো হয় বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর মাধ্যমে। নির্দিষ্ট প্রণালীগুলি এক এক জন লেখকের এক এক রকমের।

যাই হোক, লক্ষণকোষের অর্থ সুপরিস্ফুট হলেও লক্ষণ-কোষের প্রয়োজন হয় কোথায় কোথায়—এ বিষয়ে জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, লক্ষণকোষের প্রধান আবশ্যক হলো দুটি ক্ষেত্রে। রোগীর কোন একটি ব্যাপক লক্ষণের প্রকৃত সদৃশ কী হতে পারে, খুঁজে বের করবার জন্য লক্ষণকোষ এ বিষয়ে পরিচালনা ও সাহায্য করে। কোন্ কোন্ রোগী ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক সমৌষধির মধ্যে কি কি প্রয়োজনীয় পার্থক্য বিদ্যমান আছে, তার হদিশ দেবারও সাহায্য করে লক্ষণকোষ। এ দুটি ছাড়া আর এক দিকে লক্ষণকোষের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে অপরিহার্য। কোন একটি চির রোগীর যাবতীয় লক্ষণসমূহের কি কি ঔষধ হতে পারে এবং তাদের মধ্যে সদৃশতম ঔষধ হবে কোন্‌টি—সে বিষয়ে সযত্ন অনুশীলন করার সাহায্যেও পেয়ে থাকি এই লক্ষণকোষেরই মাধ্যমে।

লক্ষণকোষের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লক্ষণাবলীকে খুঁজে পেতে কুড়িয়ে এনে তৈরি করতে হবে লক্ষণের অনুরূপ সদৃশ ঔষধের কাঠামো। এটিতে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রমের

প্রয়োজন অধিক। অবশ্য কয়েকটি অনিবার্য কারণের জন্য মেটিরিয়া মেডিকা কুশলীদেরও লক্ষণকোষের প্রয়োজন হয় সময়ে সময়ে। সেই অনিবার্য কারণগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) যখন কোন একটি চির রোগীতে, বহু বিক্ষিপ্ত লক্ষণের মধ্য থেকে কয়েকটি ঔষধের চিত্র একত্রে অস্পষ্টভাবে ফুটে বের হয় ;—উক্ত অস্পষ্ট চিত্র বের হবার মূল কারণ হচ্ছে তিনটি—

প্রথমত, বহু চিকিৎসকের হাতে পোড় খাওয়া রোগীর রোগ-লক্ষণের বিকৃতি ঘটার ফলে ;

দ্বিতীয়ত, রোগীর দেহে বংশানুক্রমিক-রোগের ছাপ থাকলে, এবং

তৃতীয়ত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অব্যবস্থায় ও কুচিকিৎসার দরুণ রোগ-লক্ষণের অস্পষ্টভাব।

(২) যখন কোন একটি একদৈশিক-ব্যাধিতে ঔষধের সঠিক-চিত্র পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠে ;

(৩) যখন কোন একটি চির রোগীতে পর পর কয়েকটি ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন কোন্ ঔষধটির কখন প্রয়োজন হতে পারে—সে বিষয়ে অনুসন্ধানের সময়েও প্রয়োজন হয় লক্ষণকোষ ঘাঁটার।

রোগী-পর্যবেক্ষণ, মেটিরিয়া মেডিকা ও লক্ষণকোষের জ্ঞান পাকা হলে প্রণালীসমূহ প্রয়োগ করা যায় সহজেই। প্রণালী-সমূহ জানা থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে সাফল্য হয় দ্রুততর এবং

পরিশ্রমও বেঁচে যায় অনেকখানি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে, রোগী নিরাময় হয় প্রায় অভ্রান্তভাবে। কোথায় কোন্ প্রণালীটি কার্যকরী, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে।

প্রথম অধ্যায়

লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(১)

লক্ষণ-লিপিকরণের কৌশল

লক্ষণকোষের বা রেপার্টরির সাহায্য নেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন বিনা লক্ষণকোষেই চিকিৎসা করা চলতো অনায়াসেই। শুধু তাই নয়, স্বয়ং হ্যানিম্যান ছিলেন তৎকালীন লক্ষণকোষের ব্যবহারের বিরোধী ; অবশ্য কারণও ছিল কিছু। হ্যানিম্যানের আমলে মেটিরিয়া মেডিকায় (ভৈষজ্যকোষে) বর্ণিত ঔষধের না ছিল প্রাচুর্য, না ছিল ঔষধসমূহের সম্বন্ধে এত জটিলতা। পরন্তু, ঔষধসমূহের যাবতীয় লক্ষণের প্রকৃত লক্ষণকোষ-জাতীয় পুস্তকেরও ছিল একান্ত অভাব। যে দু-একটা লক্ষণকোষের ব্যবহার ছিল তৎকালে,—তা ছিল যথেষ্ট অসম্পূর্ণ, ভ্রান্তিমূলক এবং এমন-কি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া আর একটা বিরাট ত্রুটি ছিল, তাদের মধ্যে লক্ষণাদির কোনও বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস ছিল না, যে জন্য কাজের সময় কোনও রকমেই সে পুস্তক সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হতো প্রায় অসম্ভব। এই সব বিভিন্ন কারণেই লক্ষণকোষের প্রতি হ্যানিম্যানের বিরাগ ছিল কিছুটা। হ্যানিম্যান অবশ্য লক্ষণকোষ-মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। কারণ, লক্ষণকোষের যে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে, হ্যানিম্যান সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন

যথেষ্ট। যেহেতু, সঠিক লক্ষণকোষের প্রথম রচয়িতা, ডাঃ বোনিংহোসেনের লেখা 'Repertory of the Antipsoric Medicine, যেটি ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়, পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং হ্যানিম্যান। এ থেকে বোঝা যায় যে, হ্যানিম্যান প্রকৃতপক্ষে লক্ষণকোষের বিরোধী ছিলেন না। তা ছাড়া হ্যানিম্যানোত্তর যুগের অন্যান্য হোমিওপ্যাথ-ধন্বন্তরিগণও লক্ষণকোষের বহুল প্রচার ও ব্যবহারের ছিলেন পক্ষপাতী।

সঠিক ও সুন্দর লক্ষণকোষ রচনায়প্রথম গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত ডাঃ বোনিংহোসেনের। ইনি হ্যানিম্যানের নৈকট্যের সুযোগ পেয়ে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ছিলেন সুপরিচিত। তিনি যে লক্ষণকোষ রচনা করেন, তার কার্য-কারিতার দিক দিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই এবং তা কোনরূপ ভ্রান্তিমূলকও নয়। বোনিংহোসেনের লক্ষণকোষের মধ্যে একটা সাময়িক ত্রুটির সৃষ্টি অবশ্য হয়েছিল, যার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না মোটেই। তাঁর লক্ষণকোষের ঔষধগুলি কেবলমাত্র বহুক্রিয়ের (polychrest) মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ, সে সময়ে বহুক্রিয় ঔষধ ব্যতীত বর্তমান কালের মত এত ঔষধের প্রাচুর্য ছিল না। অবশ্য এই ত্রুটি তাঁর পরবর্তিকালে ডাঃ লিপে-এর পুত্র সংশোধন করেন এবং লক্ষণকোষটিকে করেন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ।

ডাঃ বোনিংহোসেন লক্ষণকোষের পথিকৃৎ হলেও, সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ববৃহৎ লক্ষণকোষ প্রণীত করেন স্বনামধন্য ডাঃকেন্ট।

তাঁর লক্ষণকোষই সর্বাধিক প্রচলিত। কেন্টের লক্ষণকোষের মধ্যে অনেক বহুক্রিয় ও স্বল্পক্রিয় ওষধস্থিত লক্ষণসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে সহজেই। এই সমস্ত কারণে কেন্টের লক্ষণকোষই সবিশেষ আদরণীয়। অবশ্য ডাঃ লিপের লক্ষণকোষ এবং বোনিংহোসেনের উন্নতধরনের Therapeutic Pocket-Book নামক পুস্তিকাটিও কম আকর্ষণীয় নয়। বর্তমানে আরও কয়েকটি ভাল অথচ 'সংক্ষিপ্তকরণ-দোষদুষ্ট' লক্ষণকোষ চালু আছে—যাদের ব্যবহার-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হলেও, একেবারে পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু ওগুলিকে ঠিক সর্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব-ক্ষেত্রোপযোগীর পর্যায়ে ফেলা যায় না কিছুতেই।

লক্ষণকোষ পুস্তক বাজারে যে-পরিমাণে দেখা যায়, চিকিৎসকেরা ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে সে পরিমাণে তাকে কাজে লাগান নি আজ পর্যন্ত। অবশ্য এর একটা কারণ হচ্ছে মেটিরিয়া মেডিকার পর্যাপ্ত প্রচলন। মেটিরিয়া মেডিকায় জ্ঞান যাঁদের কম নয়, তাঁরা স্বভাবতই লক্ষণকোষের বোঝা ঘাড়ে নিতে চান না। এ ছাড়া আর একটা কারণ হচ্ছে লক্ষণকোষের ব্যবহার বিষয়ে অনেকের অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব। তাই লক্ষণকোষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমেই একটা বিরাট প্রশ্ন খাড়া হয় যে, লক্ষণকোষ বলতে কী বোঝায়? তার উত্তর কি হবে সে কথা পূর্বাভাষে বলা হয়েছে।

লক্ষণকোষের ব্যবহার কোথায় কোথায় অত্যাবশ্যক সে বিষয়েও পূর্বাভাষে বলেছি ; কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে লক্ষণকোষের সহায়তা লওয়া অনাবশ্যক, তাও আমাদের জানা দরকার। যেখানে similimum বা সদৃশতম ঔষধটি রোগীর লক্ষণাবলী থেকে সহজেই ধরা পড়ে, সেখানে লক্ষণকোষ দেখা সময়ের অপব্যয় মাত্র। কারণ, সেই রোগীতে লক্ষণগুলি এমনভাবে চিকিৎসকের সামনে দেখা দেয় যে, সেক্ষেত্রে লক্ষণকোষ ব্যবহার করতে হলে, কেবলমাত্র তার প্রধান লক্ষণসমূহ কোন্ কোন্ ঔষধে বর্তমান, তা মিলিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না ; এমনিভাবে লক্ষণকোষ-ঘাঁটার ফল যদিও সেই একই হয় ; অর্থাৎ পূর্বোক্ত similimum ঔষধটিই সূচিত হয় ; এখানে লক্ষণকোষে কেবলমাত্র সূচিত-ঔষধটিকে যাচাই করা ছাড়া আর কিছুই করে না। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকায় যাঁদের জ্ঞান পরিপক্ক, তাঁদের পক্ষে অমনিতরো সুনির্দিষ্ট রোগ-লক্ষণে, ঔষধ বাছাইয়ের জন্য লক্ষণকোষের সাহায্য নেওয়া মানেই নিজের স্মরণশক্তিকে অবিশ্বাস ও অবহেলা করা। সর্বত্রই লক্ষণকোষ-ঘাঁটার অভ্যাসও যুক্তি-সঙ্গত নয়। তাতে মেটিরিয়া মেডিকার প্রতি আস্থা যায় কমে, নিজের চিন্তাশক্তির উপর হয় অবিচার। লক্ষণকোষ-ব্যবহারের নিয়মকানুন জেনে রাখা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার সাহায্য নেওয়া যেমন দরকার, তেমনি মেটিরিয়া মেডিকার প্রত্যেকটি ঔষধকে সম্পূর্ণরূপে অধিগত করাও আবশ্যক। কেন না, হাতের কাছে সদা সর্বদা লক্ষণকোষ রাখা সম্ভব নয়, সুবিধা তো নয়ই।

যদিও বা কেউ সঙ্গে রাখার অভ্যাস করেন সময়ের স্বল্পতাহেতু সর্বক্ষেত্রে তা উল্টানোর সুযোগ না-ও পেতে পারেন। কাজেই, সর্বত্র মেটিরিয়া মেডিকার উপর দখল থাকা চাই পুরাদস্তুর এবং লক্ষণকোষের উপর নির্ভর করতে হবে তখনই,—যখন রোগীর অবস্থা যথেষ্ট সময় দেবে—এবং সেই সঙ্গে যেখানে মেটিরিয়া মেডিকার তরীতে কুল মিলবে না সহজে।

কিন্তু লক্ষণকোষ-ঘাঁটা যতখানি সহজ মনে হয় ঠিক ততখানি নয়। লক্ষণের বিরাট পরিধির মধ্যে ঠিক ঠিক লক্ষণকে বাছাই করা অত্যন্ত শক্ত কাজ। বিশেষত রোগীর মুখের ভাষার সঙ্গে লক্ষণকোষের ভাষার তফাৎ অনেকখানি; তার-পরে আছে লক্ষণের এক বা একাধিক স্তর-বিন্যাস এবং শেষত রয়েছে লক্ষণ-নির্দেশক ঔষধের গুরু-লঘু জ্ঞানের উপর রোগী-ক্ষেত্রে ঔষধ বাছাইয়ের জটিল সমস্যা। অবশ্য প্রত্যেক সমাধান-যোগ্য সমস্যারই একটা না একটা পথ থাকে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার। এক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি সমাধান আছে যা না জানলে লক্ষণকোষ হাতে পেয়েও কোনও কাজে লাগান হয় অসম্ভব। কেমনভাবে সেই সমাধানে পৌঁছানো যাবে তা বার করতে হলে, চিকিৎসকের সর্বাগ্রে দক্ষতা চাই **লক্ষণ-লিপি-করণ-কৌশলে**।

লক্ষণকোষ ব্যবহার করার পূর্বেই, রোগী-পর্যবেক্ষণ ও লক্ষণসমাবেশ করার দিকে মনোযোগ দিতে হয় সুষ্ঠুভাবে। রোগীর লক্ষণসমূহকে সঠিকভাবে সঞ্চয় করার উপরেই, লক্ষণ-কোষ ব্যবহারের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে বহুল পরিমাণে। লক্ষণাবলী সু-সঞ্চয়ের মূলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় পর্য-বেক্ষণের। পর্যবেক্ষণ কথাটা সাধারণত ব্যবহৃত রোগীদর্শন বা দেখা কথাটা অপেক্ষা অধিক অর্থ-বহনযোগ্য। যেহেতু, চিকিৎসক তাঁর রোগী-পর্যবেক্ষণকালে, একমাত্র দৃষ্টিশক্তিরই উপর নির্ভর করেন না; পরন্তু, অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপরও নির্ভর করেন অনেকখানি এবং বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাইও করেন সেই সঙ্গে। যাই হোক, রোগী-পর্যবেক্ষণ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করে—প্রথমত, রোগী নিজে, দ্বিতীয়ত, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী এবং তৃতীয়ত চিকিৎসকের পরীক্ষণ-প্রণালী।

রোগী-বর্ণিত লক্ষণাবলীকে আমরা subjective symptoms বলি; এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ঔষধ বাছাইকারী। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর সংগৃহীত লক্ষণাবলী হলো objective symptoms এবং উক্ত উভয় প্রকারের লক্ষণাবলীর সমষ্টিকেই বলা হয়—totality of symptoms বা লক্ষণাবলীর সামগ্রিকতা। সামগ্রিক-লক্ষণ সঞ্চয় সঠিক হওয়ার উপরেই নির্ভর করে লক্ষণকোষ ব্যবহারের সাফল্য। রোগী-লক্ষণ লিপিকরণের সময় চিকিৎসককে সাধারণত একটি বাধার সম্মুখে পড়তে হয়; সেটি হচ্ছে—রোগীর রোগ-লক্ষণ

বর্ণনার অসম্পূর্ণতা। রোগীর পূর্ণ বিবরণদানের অন্তরায় হলো প্রধানত তিনটি, যার ফলে অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

১। লক্ষণ-বর্ণনায় রোগীর অমনোযোগিতা এবং বিশ্লেষণ-করণের মানসিক অভাব।

২। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে, রোগ-লক্ষণের সঙ্গে স্বাস্থ্যের লক্ষণাবলীর মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ের অপারগতা; লক্ষণ-বর্ণনায় ভুল তথ্যদান এবং কোন কোন লক্ষণ উল্লেখ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মরণ।

৩। রোগীর মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী রোগ-লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে বলার স্বভাব; এবং অজ্ঞান ও শিশু-রোগীর ক্ষেত্রে subjective symptoms সংগ্রহের সম্পূর্ণ অভাব।

উক্ত প্রকারের তিনটি অবস্থার জন্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর নিকট থেকে চিকিৎসক-মাত্রই অসম্পূর্ণ রোগী-চিত্র পেয়ে থাকেন, প্রধানত তিনটি দিক হতে; প্রত্যেক লক্ষণের বেলাতেই নিম্নোক্ত যে কোনও এক বা একাধিক ঘাটতি থাকে ঃ—

(ক) লক্ষণের অবস্থান (location) নির্ণয়ের অপারঙ্গ-মতা; (খ) লক্ষণের অনুভূতি (sensation) বর্ণনায় অক্ষমতা এবং (গ) হ্রাস-বৃদ্ধির যে কোনও একটির অথবা উভয়ের বিষয়েই কোনরূপ বিশ্লেষণ করার অজ্ঞতা।

উপরোক্ত তিনটি অসম্পূর্ণতা মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি (moda-

lities) বিষয়ক অজ্ঞতাটিই হচ্ছে ঔষধ বাছাই করণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অসুবিধা সৃষ্টিকারী ; কারণ, হ্রাস-বৃদ্ধিজাত লাক্ষণিক অবস্থাটি হচ্ছে ঔষধনির্ণয়ের চুম্বক।

এক্ষণে, উপর্যুক্ত রোগী-লিপির অসম্পূর্ণতা দূর করবার উপায় কী ? উপায় অবশ্য একটা আছে। এক্ষেত্রে, রোগী-লিপিকরণে একটু দক্ষতা দরকার। ঐ দক্ষতাটি অর্জন করতে হলে, ঔষধ-পরীক্ষণকালীন লক্ষণাবলী বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। রোগী-লক্ষণ-সংগ্রহে যে অসম্পূর্ণতা দেখি, সে অপূর্ণতা ঔষধ-পরীক্ষণের বেলাতেও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঔষধ-পরীক্ষণকালে পরীক্ষকের পক্ষেও অবস্থান, অনুভূতি ও হ্রাস-বৃদ্ধির লক্ষণ-সঞ্চয়ের বিষয়েও অপূর্ণতা থেকে যায়। সেই কারণে, ঔষধ-পরীক্ষার বেলা অনেকানেক পরীক্ষকের উপরেই ঔষধের পরীক্ষণ প্রয়োজন ;—যাতে একজনের বিবরণ অসম্পূর্ণ হলেও, অপরের বিবরণ-লিপি থেকে সেই ফাঁকটি ভরাট করে নেওয়া হয়। তাই, ঔষধজাত লক্ষণাবলী বিশেষ অপূর্ণ থাকে না, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া। ঔষধ-পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষকের মধ্যে থেকে ঔষধের চিত্রটি তৈরী হয় লক্ষণাবলীর সাদৃশ্যের অনুরূপ অনুযায়ী। বহুজনে পরীক্ষিত ঔষধের মধ্যে তাই অসম্পূর্ণতা-দোষটি অনুপ্রবেশের অবকাশ পায় না বড় একটা।

কিন্তু এ ছাড়া আর একভাবে পরীক্ষক উক্ত অসম্পূর্ণতা দোষটি দূর করে থাকেন তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে। কোন এক অঙ্গের অনুভূতি লক্ষণের অভাবে অথবা হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে,

যে অসম্পূর্ণতার ফাঁক দেখা দেয়, সেটিকে অন্য অঙ্গের অনুভূতির বা হ্রাস-বৃদ্ধির সাদৃশ্য অনুযায়ী ভরাট করে তোলা হয়। সন্দেহ হতে পারে যে, এ ধরনের অধ্যারোপ কতখানি নীতি-সঙ্গত। যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরীক্ষক যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করেন, সেগুলি প্রায়শই কয়েকটি সম্পূর্ণ-লক্ষণের ভগ্নাংশ মাত্র। মূল পরীক্ষক সেই অংশগুলিকে একীভূত করে লক্ষণের সম্পূর্ণতা সাধন করেন। ঔষধ-পরীক্ষণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও একীকরণের এই হলো সাধারণ পদ্ধতি।

এক্ষণে রোগী-লিপিকরণের কথায় ফেরা যাক। রোগীর লক্ষণ-সঞ্চয়ের বেলা চিকিৎসক মাত্রই এটি খেয়াল রাখেন যে, তাঁরা রোগীর চিকিৎসা করছেন, রোগ বা রোগ-লক্ষণাবলীর নয়। কাজেই, লক্ষণাবলী-সংগ্রহের সময়ও তাঁরা লক্ষণের সামগ্রিকতার অর্থাৎ, রোগীর দিকে দৃষ্টি রাখেন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে রোগী-বর্ণিত কোন এক বা একাধিক স্থানীয়-লক্ষণের (particular symptoms) উপর তত গুরুত্ব দেন না, যেহেতু সেগুলি হচ্ছে, ব্যাপকার্থে, রোগীর ব্যাপক-লক্ষণের (general symptoms) অংশ মাত্র। কয়েকটি স্থানীয়-লক্ষণকে একটি বিশিষ্ট বিন্যাসের ভিত্তিতে রোগীর আংশিক-লক্ষণকে সম্পূর্ণাঙ্গ-লক্ষণের পর্যায়ে নিয়ে আসার কৌশলই হচ্ছে, রোগী-লিপিকরণে দক্ষতার পরিচায়ক। উক্ত আংশিক লক্ষণগুলি রোগীদেহের এদিকে সেদিকে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে থাকে ; যেমন আমরা লক্ষণ-

কোষে বর্ণিত লক্ষণাবলীর মধ্যে দেখতে পাই। এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লক্ষণগুলির কেউ বা অনুভূতি-জ্ঞাপক কেউ বা অবস্থান নির্দেশক, আবার অপরাপর কয়েকটি থাকে হ্রাস-বৃদ্ধিজাত লক্ষণ হিসাবে। তাই হ্যানিম্যান বলেছেন যে—পীড়াটি হচ্ছে রোগীর,—তার মাথা, চোখ, হাত-পায়ের অথবা হৃৎপিণ্ডের নয়; মাথার দপ্‌দপানি ব্যথা শুধু যে মাথারই লক্ষণ, তা নয়, ওটি সমগ্র রোগটিরই অবস্থাসূচক লক্ষণ; কিম্বা শরীরের কোন অঙ্গের ব্যথা-বেদনা <চলা-ফেরায় অথবা মাথাঘোরা<সন্ধ্যা-কালে,—এ সবই যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা জানিয়ে থাকে, তেমনি ওরা রোগটির সাধারণ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতিও আলোক-সম্পাত করে। এ ছাড়া, আর যে সব লক্ষণ থাকে, যেমন সর্বাঙ্গে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি—তাদের বলা হয় সহচর-লক্ষণ (concomitant symptoms)। সহচর-লক্ষণ ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণাবলীর সমাহারে গঠিত হয় লক্ষণের সামগ্রিকতা (totality of symptoms)। সামগ্রিক-লক্ষণাবলীই হচ্ছে, রোগীর পূর্ণাঙ্গ-চিত্র। সামগ্রিকতার সাহায্যে আমরা রোগীর ব্যক্তিত্বের বাস্তবীয়তার হদিশ পাই। রেপার্টরির সাহায্যে ঔষধ বাছাই করার কাজে ওরা হল একান্তভাবে অপরিহার্য।

এক্ষণে আমরা একটি সমন্বয়-সূত্রের সন্ধান পাই। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক স্থানীয়-লক্ষণই হচ্ছে, অবস্থান-অনুভূতি-হ্রাস-বৃদ্ধির বিচ্ছিন্ন সমাবেশ। অতএব, সামগ্রিকতা গঠিত হচ্ছে—ব্যাপক-লক্ষণের ও অবস্থান-অনুভূতি-হ্রাস-বৃদ্ধির

সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহার। অর্থাৎ, রোগীর সামগ্রিক-লক্ষণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকতে হলে, আমাদের স্থানীয়-লক্ষণ-গুলির সাধারণ-বৈশিষ্ট্য (যা রোগীর ব্যাপক-লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে) সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে, স্থানীয়-লক্ষণের অন্যান্য বিশেষত্বও লক্ষ্য করতে হবে।

উক্ত লক্ষণের একত্র সমাবেশের পর, প্রত্যেক রোগী ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সমীকরণের সাহায্যে লক্ষণকোষ থেকে টেনে বার করতে হবে তার সদৃশ ঔষধটি। আমরা সাধারণত যে সব রোগী পাই আমাদের চিকিৎসার গণ্ডীতে, তাদের মধ্যে দেখতে পাই দু শ্রেণীর লক্ষণ—(১) রোগ-নির্ণায়ক লক্ষণাবলী এবং (২) ঔষধ-নির্বাচক লক্ষণাবলী।

রোগ-নির্ণায়ক লক্ষণাবলী প্রায় প্রতি রোগীতেই এক প্রকারের ; কাজেই, ওদের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-নির্বাচন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঔষধ-নির্বাচক লক্ষণাবলীই হচ্ছে আমাদের লক্ষণ-সংগ্রহের লক্ষ্যস্থল। ডাঃ হ্যানিম্যানের ভাষায়, সেই সমস্ত **অসাধারণ সিদ্ধিপ্রদ** (characteristic) লক্ষণাবলীই হলো ঔষধ-বাছাইকারী। প্রত্যেক রোগীতেই এদের অল্প-বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী ; সাধারণত যে শীত-তাপ-ঘর্ম দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক রোগীতেই, তা হচ্ছে রোগ-নির্দেশক লক্ষণবিশেষ। কিন্তু কারো জ্বর আসে বেলা ৯টায়, কারো বা বেলা ১১টায় ; কারো শীত সুরু হয় পীঠের শিরদাঁড়া বেয়ে—ইত্যাকার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণাবলী, উক্ত

জ্বরের ঔষধ-বাছাইকারী লক্ষণ। রোগী-চিত্র অঙ্কনের সময় উক্তপ্রকার খুঁটিনাটি অসাধারণ, সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ-সঞ্চয়ের উপরেই নির্ভর করে রোগ আরোগ্যের সফলতা। সাধারণ শ্রেণীর লক্ষণসমূহ এক্ষেত্রে অচল।

ঔষধ-নির্বাচক লক্ষণাবলী একত্রীকরণের ফলেই রোগীর লাক্ষণিক-সামগ্রিকতা গড়ে ওঠে; চিকিৎসকের কাজই হচ্ছে উক্ত সামগ্রিকতার সন্ধান করা। এ ছাড়া লক্ষণ-লিপিকরণের অন্য কোনও সার্থকতা নেই। লক্ষণ-লিপিকরণকালে যে সামগ্রিকতার সমাবেশ ঘটে, সেটিকেই রোগী চিত্র, রোগীর স্বকীয়তা (individualism) ইত্যাদি ভিন্ন নামের গণ্ডীতে বাঁধা হয়। আসলে আমরা লক্ষণ-সঞ্চয়ের সময়ে রোগীর এমন একটি চিত্র আঁকবার চেষ্টা করি, যার সাহায্যে প্রকৃত রোগারোগ্যকারী ঔষধের প্রতিফলন সম্ভব। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, রোগীর লাক্ষণিক সামগ্রিকতা হচ্ছে নির্বাচিত ঔষধের সদৃশ-লক্ষণাবলীর কার্বন-কপি। রোগী ও ঔষধের উক্তসদৃশতা সন্ধানের উপরেই নির্ভর করে চিকিৎসকের লক্ষণকোষ ব্যবহারের সার্থকতা।

চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, নির্ভুল লক্ষণ-লিপিকরণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত উপায়ে লক্ষণাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাসের উপরেই আরোগ্যদায়ী ঔষধ-নির্বাচনের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। ঔষধের ক্রিয়া-পরীক্ষণের সময়েও যেমন উক্ত গুণাবলীর প্রয়োজন, তেমনি কোন একটি রোগের —সেটি সমষ্টিগতভাবে মহামারী আকারেই আত্মপ্রকাশ

করুক অথবা ব্যষ্টিগত রূপেই দেখা দিক—চিকিৎসার বেলাতেও ওদের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে অপরিহার্য।

কোন একটি রোগের প্রকৃত স্বরূপটি পেতে হলে, আমাদের প্রয়োজন হয় অনেকগুলি ঐ জাতীয় রোগীকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যেমন আমরা একটি ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণাবলীর পরিচয় পেতে বহু পরীক্ষকের লক্ষণসমূহকে একত্রিত করে থাকি। কোন একজন মাত্র পরীক্ষকের লক্ষণ-সমষ্টি থেকে ঔষধের সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাওয়া যায় না কখনও। নানা বয়সের বহু মেয়ে-পুরুষের দ্বারা পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণ-সমূহকে একত্রে সংগ্রহ করার ফলে ঔষধের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব। ব্যষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লক্ষণাবলীর সমষ্টি থেকে যে সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেটিই হচ্ছে রোগী-পর্যবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য।

ব্যাপক মহামারী রোগের ঔষধ-নির্বাচনের বেলাতেও আমাদের রোগী-পর্যবেক্ষণের উক্ত ধারাটিকেই অনুসরণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এখানেও আমরা ব্যষ্টির গণ্ডী থেকে সমষ্টির প্রাঙ্গণে পা বাড়িয়ে থাকি। কয়েকটি রোগীর ব্যষ্টিগত লক্ষণাবলীকে একত্রে সমাবেশ করার ফলে, যে সামগ্রিকতা ফুটে ওঠে, তার থেকেই প্রকৃত ঔষধের হদিশ পাওয়া যায় অতি সহজেই। প্রশ্ন হতে পারে এখানে হোমিওপ্যাথির রোগী-স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে আমল না দেওয়ার গূঢ়ার্থ কী? তার জবাব হচ্ছে এই যে, মহামারী রোগের যে প্রাদুর্ভাব হয়, তার মূলে থাকে মানুষের মধ্যে সুপ্ত সোরার আকস্মিক জাগরণ অথবা

দেহমধ্যে কোন বীজাণুর অনুপ্রবেশ কিম্বা আর কিছু কারণ। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, একই বীজাণু বা সোরা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন লক্ষণাদি প্রকাশ করে কিরূপে? এখানেই ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয়তার কথা আসে। স্বকীয়তার পরিবেষ্টনের প্রভাবে একই বীজাণু বা সোরা থেকে বিভিন্ন লক্ষণের আত্মপ্রকাশ হয়। তাই আমরা স্বকীয়তার যে-ক্ষেত্র তার উপরেই বিশেষ জোর দিই; বীজাণু ইত্যাদির কথা আসে তারপর। এ যেন একই মাটিকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর রূপায়তন করার প্রাকৃতিক প্রচেষ্টা।

কোন রোগীবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধের যাবতীয় লক্ষণাবলী যেমন উক্ত রোগীর মধ্যে দেখা যায় না, তেমনি কোন রোগীর যাবতীয় লক্ষণাবলীও একটি ঔষধের সমস্ত লক্ষণের প্রতিচ্ছবি দেয় না। এ ক্ষেত্রে হ্যানিম্যান নির্দেশিত সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণসমূহের সাদৃশ্যগত ঔষধ পেয়ে গেলে কাজ আর আটকায় না।

লক্ষণ-লিপিকরণের সময় চিকিৎসকের প্রধান কাজ হচ্ছে —রোগীর দেহে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা লক্ষণাবলীকে এক একটি নির্দিষ্ট শিরোনামায় গণ্ডীবদ্ধ করা; তাদের অসম্পূর্ণ লক্ষণগুলিকে সম্পূর্ণতার কোঠায় নিয়ে যাওয়া; পরে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে লক্ষণসমূহকে একটি ছকে (chart) বিন্যাস করা; এই বিন্যাসকরণের পরে লক্ষণকোষের সাহায্যে অথবা মেটিরিয়া মেডিকার সাহায্য নিয়ে ঔষধ-নির্বাচন করা যাবে অতি সহজেই।

লক্ষণ-লিপিকরণের প্রণালী আছে নানা ধরনের ; ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। কেউ লক্ষণসমূহকে রোগীর মুখ থেকে হুবহু লিখে নিয়ে, কোন বিন্যাসের ধারে পাশে না ঘেঁসেই ঔষধ বাছাই করেন ; অনেকে আবার হ্যানিম্যানের হুকে লক্ষণাবলীকে সাজিয়ে নেন প্রথমে ; হ্যানিম্যানের লক্ষণ-সংগ্রহের ছকটি হচ্ছে—মন থেকে সুরু করে মাথা, মুখ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অ-প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় লক্ষণাবলীকে পরপর সাজিয়ে নেওয়া। আবার অন্য কারও প্রণালী হচ্ছে—লক্ষণ-সমূহের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী লক্ষণাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। লক্ষণ-লিপিকরণ-প্রণালীর ভাল-মন্দের তর্ক তোলা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। আমি আর এক প্রকার নিজস্ব ধারায় লক্ষণ লিপিবদ্ধ করি। এটিতে আমি অন্য প্রণালীগুলি থেকে কিছুটা সুবিধা বুঝি। পাঠকবৃন্দকে সেটি উপহার দিতে চাই। আমি অবশ্য পুরাতন রোগী ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত প্রণালীতে লক্ষণ-লিপিকরণের আবশ্যকতা মনে করি।

লক্ষণ-লিপিকরণের একটি স্বতন্ত্র নোটবই বা খাতা রাখা উচিত প্রত্যেক চিকিৎসকেরই। উক্ত নোটবইটির প্রত্যেক পাতাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম কলমটিতে (column) থাকবে রোগীর লক্ষণাবলী। এখানে রোগীর যাবতীয় লক্ষণাবলী তার মুখের ভাষানুযায়ী হুবহু লিখে নিতে হবে। এই কলমটিতে থাকবে রোগীর অবিন্যস্ত লক্ষণাবলীর বর্ণনা। দ্বিতীয় কলমটিতে থাকবে উক্ত লক্ষণা-

বলীর বিন্যস্ত রূপ। এখানে লক্ষণের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রত্যেকটি লক্ষণকে এক একটি লাইনে পরপর সাজাতে হবে এবং সেই সঙ্গে রোগীর ভাষাকে নিয়ে আসতে হবে লক্ষণকোষে ব্যবহৃত ভাষায়। প্রত্যেকটি লক্ষণকে সাজাতে হবে এমনভাবে যাতে প্রত্যেকটি লক্ষণের পর থাকবে কিছুটা শূন্যস্থান বা ফাঁক। তৃতীয় কলমটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় কলম অপেক্ষা অধিক পরিসর করতে হবে। এটিতে থাকবে রোগীর প্রত্যেকটি বিন্যস্ত লক্ষণের লক্ষণকোষ থেকে বাছাই করে আনা ঔষধের নামাবলী। কাজেই এদের স্থান-সঙ্কুলানের জন্য খাতাটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা দরকার।

ধরুন, খাতাটির সাইজ হইবে ৬″×৮″ ইঞ্চি। ইচ্ছা করলে সাইজ বাড়িয়েও নেওয়া যেতে পারে। তবে খাতার ফোড় সেলাইটি থাকবে খাতার চওড়া দিকটায়; অর্থাৎ এক্ষেত্রে সেলাইটি হবে ৬″ মাপের দিকে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা থেকে, খাতার বামদিকের পাতা ও ডানদিকের পাতাকে একটি পাতা হিসাবে গণ্য করে কলম-গুলি (columns) টেনে নিতে হবে। বামদিকের পাতাটিকে (অর্থাৎ ২য় পৃষ্ঠায়) দুটি সমান কলমে ভাগ করতে হবে এবং ডানদিকের পাতাটি থাকবে ৩য় কলমের প্রয়োজনে। এমনিভাবে খাতার উভয় পাতাকেই (বাম ও ডান) একত্র মিলিত করে তিন কলমে ভাগ করে নিতে হবে। পরিশিষ্ট ভাগে রোগী-লিপিকরণের ছকটি (উদাহরণ সহ) এঁকে দিলাম; উদাহরণ স্থলে, রোগীর লক্ষণ-লিপিকরণের ও

লক্ষণকোষ থেকে উক্ত লক্ষণাবলীর নির্বাচিত ঔষধের তালিকাটিও উল্লেখ করা হয়েছে ; আশা করি, পাঠক-সাধারণ আমার লক্ষণ-লিপিকরণের কৌশলটি বুঝতে পারবেন পরিশিষ্ট (খ)এর ছকটি থেকে।

মোটামুটিভাবে এই তো গেল লক্ষণ-লিপিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী। রোগীসমূহের লক্ষণ-লিপিকরণের পর প্রয়োজন হবে লক্ষণকোষ থেকে লক্ষণানুগ-ঔষধসমূহকে বাছাই করা। এই বাছাই-বিদ্যা আয়ত্ত করতে হলে লক্ষণ-কোষ-ব্যবহারতত্ত্বেও পারদর্শিতা প্রয়োজন।

লক্ষণকোষ-ব্যবহারের আদিতে প্রয়োজন হয় রোগী-পর্যবেক্ষণের এবং সেই সঙ্গে জানতে হয় লক্ষণকোষ থেকে ঔষধ বাছাই করার প্রণালী। আদিকথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ; এখন প্রয়োজন হচ্ছে বাছাই-পদ্ধতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। ঔষধ যাচাই-বাছাই করবার পদ্ধতির পরেই নির্ভর করে লক্ষণকোষ ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা। নানা প্রণালীর খাত বেয়ে ঔষধ-নির্ণয় করা যেতে পারে, কিন্তু যে-প্রণালী মাধ্যমে লক্ষণকোষ ব্যবহারের সুবিধা সে-বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অবশ্য, তার আগে লক্ষণ-কোষ গ্রন্থটির বিশেষ পরিচয় লওয়া প্রয়োজন এবং সেটিকে কার্যক্ষেত্রে কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাও জানা দরকার। পরবর্তী অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে সবিস্তারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব (২)

লক্ষণকোষ পরিচয়

আরোগ্যের প্রথম সোপান হল, রোগে কী আরোগ্য করতে হবে সে বিষয়ে জানা। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রোগীক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন দেখা গেছে,—যা তার সুস্থাবস্থায় ছিল না, কিন্তু রুগ্নাবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে—সেই পরিবর্তনগুলিই, সেই মানসিক ও দৈহিক লক্ষণাবলীই, আরোগ্যের প্রথম সোপান তৈরি করবে। আমরা জানি যে, সব লক্ষণই সমান কাজের নয়, সেগুলি আরোগ্য করার জন্য মাথা ঘামানো, শুধুই মস্তিষ্কের অপব্যয়মাত্র। এজন্যই ডাঃ হ্যানিম্যান প্রশ্ন তুলেছেন—রোগে কী আরোগ্য করিতে হইবে। কী আরোগ্য বলতে, কোন্ কোন্ লক্ষণ দূর করা প্রয়োজন—সেইগুলিই আমাদের লক্ষণ-লিপিকরণের সময় খুঁজে বের করতে হবে। অর্থাৎ, যে লক্ষণগুলি রোগীর সত্তাকে প্রকাশ করবে, সঠিক রোগীর পরিচয় জানাবে—সেই সব রোগী-নির্দেশক লক্ষণাবলীই হলো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের অনুসন্ধানের বিষয়।

তাই, হ্যানিম্যান বারংবার বলেছেন, চিকিৎসকের চিন্তার বিষয় রোগ নয়, রুগ্ন ব্যাক্তি; রোগীক্ষেত্রে আমরা সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বার করবো, যে কিনা রোগ-ভোগ করছে; আমরা খুজবো সেই একজনকে, যে স্বাভাবিক

স্বজাতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার নিজের স্বাভাবিক অবস্থা থেকেও যে দূরে সরে গেছে। মানবীয় সমাজের অর্থাৎ সমষ্টিগত এবং নিজের অর্থাৎ ব্যষ্টিগত স্বাভাবিকতা থেকে, সেই সব পরিবেশ থেকে, দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিকতা থেকে—যখন কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই আমরা তাকে রোগী বলি, এবং তার সেই বিচ্ছিন্ন-পরিবর্তিত ব্যক্তি সত্তাটিকে খুঁজে বার করি। কিন্তু কেন এই খোঁজাখুঁজি? তার সোজাসুজি উত্তর হলো—তাকে তার সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত স্বাভাবিকতার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে তার স্বাচ্ছন্দ্যকে পূর্ববৎ বজায় রাখা, যাকে বলা হয় আরোগ্য।

এবার আমাদের দ্বিতীয় সোপান হলো, এই আরোগ্য সম্পাদন করতে হলে কোথায় তার হদিশ মিলবে। কবির ভাষায় বলবো—'কোথায় পাবো তারে'? সেই হারানো-মাণিকের অনুসন্ধান আমরা কোথায় করবো, এবং সেই হারানো-মাণিকটাই বা কি? রোগীর আরোগ্য-সম্পাদনে হারানো-মাণিক হলো—আরোগ্যকারী ঔষধ। এবং সে ঔষধটি অবশ্যই হোমিওপ্যাথিক খনি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

অমূল্য সম্পদের খনি হলো মেটিরিয়া মেডিকা; কিন্তু রেপার্টরি বা লক্ষণকোষ-বস্তুটি কি? সেটি হলো সেই খনিরাজ্যে নির্দিষ্ট মাণিকটি সংগ্রহ করবার জন্য বিভিন্ন প্রবেশপথ। লক্ষণকোষ প্রবেশপথ দিয়ে আমরা সঠিক

মাণিক সঞ্চয় করতে পারি; তার জন্য প্রবেশপথের বহু সোপানশ্রেণী অতিক্রম করতে হয়, প্রয়োজন হয় পরিশ্রমের। তবে পরিশ্রমের অনেকখানিই লঘু হয়ে যায়, যদি আমরা সোপান অতিক্রমের নিয়মগুলি মেনে চলি।

তা হলে সেই নিয়মগুলি কি কি?

রোগীর বিবরণ অনুযায়ী তাদের বিভিন্নতা দেখা যায়। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে যে নিয়মপন্থা সতত ব্যবহারোপযোগী ও নিশ্চয়ার্থক বলে মনে হয়েছে, তা হলো ডাঃ কেন্টের নিয়মাবলী—

এখানে প্রথমত **রোগীর মানসিক লক্ষণগুলির** ওপর সবচেয়ে **গুরুত্ব** দেওয়া হয়;

তারপর, **দৈহিক সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলীর** এবং

সর্বশেষে **দৈহিক স্থানীয় লক্ষণাবলীর** স্থান নির্দেশ করা হয়।

কেন্টের উক্ত মতানুযায়ী কি ভাবে আমরা রোগীক্ষেত্রে ঔষধ-নির্বাচন করতে পারবো, তাঁর লক্ষণকোষে কী ভাবেই তার হদিশ পাবো জানতে হলে, সর্বাগ্রে তাঁর লক্ষণকোষ কী রকম ছকে গ্রথিত হয়েছে, তার বিস্তারিত পরিচয় আমাদের জানা চাই। কেন্টের 'রেপার্টরি' বা 'লক্ষণকোষ' গ্রন্থটি সুবৃহৎ; আমাদের ভারতীয় সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৩৬। পুস্তকটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও তাদের ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যানুযায়ী। সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে মন এবং সর্বশেষে স্থান পেয়েছে

সার্বাঙ্গিক (generals)—এবং উভয় বিভাগের মধ্যবর্তী পত্রসমূহে রয়েছে নিম্নোক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভাগগুলি—

১। শিরোঘূর্ণন (vertigo)
২। মস্তক (head)
৩। চক্ষু (eye)
৪। দৃষ্টি (vision)
৫। কর্ণ (ear)
৬। শ্রবণশক্তি (hearing)
৭। নাসিকা (nose)
৮। মুখমণ্ডল (face)
৯। মুখগহ্বর (mouth)
১০। দন্ত (teeth)
১১। গলাভ্যন্তর (throat)
১২। পাকস্থলী (stomach)
১৩। উদর (abdomen)
১৪। মলদ্বার (rectum)
১৫। মল (stool)
১৬। মূত্রযন্ত্রাদি,
(urinary organs)
(ক) মূত্রস্থলী (bladder)
(খ) মূত্রাশয় (kidneys)
(গ) প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড
(prostate gland)
(ঘ) মূত্রনালী (urethra)
(ঙ) মূত্র (urine)
১৭। জননযন্ত্রাদি
(genitalia)
স্ত্রী-জননযন্ত্রাদি
(genitalia-female)
১৮। স্বরনালী ও শ্বাসনালী
(larynx and trachea)
১৯। শ্বাস-প্রশ্বাস
(respiration)
২০। কাশি (cough)
২১। কফ ও থুথু
(expectoration)
২২। বক্ষ (chest)
২৩। পৃষ্ঠদেশ (back)
২৪। হস্ত-পদাদি
(extremities)

২৫। নিদ্রা (sleep)
২৬। শৈত্য (chill)
২৭। জ্বর (fever)
২৮। ঘর্ম (perspiration)
২৯। চর্ম (skin)

এবং সর্বপ্রথমেই আছে মন (mind) আর সর্ব শেষে স্থান পেয়েছে সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলী (generalities) —এ কথা পূর্বেই বলেছি। প্রত্যেকটি বিভাগই যাতে সহজেই বার করা যায় এমনভাবে খাঁজ কেটে পত্রসূচী তৈরি করা হয়েছে। বইটি মুদ্রণ ও গ্রন্থন কার্যেও যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়েছে নিঃসন্দেহে। এবার পুস্তকের অন্তর্বিভাগ কী ভাবে সাজানো হয়েছে, তারই উল্লেখ করছি এখানে।

মন হলো ইন্দ্রিয়রাজ; তাই মানসিক লক্ষণগুলি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং সেই কারণেই লক্ষণ-কোষের প্রথমভাগেই মানসিক লক্ষণের সমাবেশ। অনেক সময় ২।৩টি উল্লেখযোগ্য মানসিক লক্ষণ পাওয়া গেলে, চির-রোগীর ঔষধ-নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে। কেন্টের মতে মানসিক লক্ষণের মূল্যমান সর্বোচ্চ। তিনি মানসিক লক্ষণের যে ক্রমিক মূল্যমান স্থির করেছেন, তা হলো—

সর্বোচ্চ-পর্যায়ে—**আকাঙ্ক্ষা** বা কামনা-বাসনা—যেমন ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, লোভ, লালসা সম্বন্ধীয়;

মধ্যম-পর্যায়ে—**বুদ্ধি-বিচার**—যেমন, ভ্রম, ভুল-বকা, বিশেষ শ্রুতি-দর্শন ইত্যাদি;

নিম্ন পর্যায়ে—**স্মৃতি** সম্পর্কীয় লক্ষণাবলী।

ডাঃ কেন্ট লক্ষণাবলীর গুরুত্বানুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তার একটি ছক পরিশিষ্ট (ক)-এ উদ্ধৃত করে দিলাম।

লক্ষণকোষ থেকে ঔষধ বাছতে হলে প্রথমেই মনের কথা মনে পড়া চাই, এবং সর্বশেষে নজর দিতে হবে সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলীর ওপর—তার মাঝে থাকবে বাকী সব লক্ষণাবলীর ভীড়। এই ভাবে কেন্টের লক্ষণকোষের লক্ষণগুলিকে সাজানো হয়েছে।

অবশ্য লক্ষণগুলিকে যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, সে জন্য বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা হয়েছে, ঠিক যে-কোনও অভিধানের মত, অ থেকে সুরু করে ক্ষ অর্থাৎ a থেকে z পর্যন্ত। এই বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস হেতু যে কোনও একটি লক্ষণকে অতি দ্রুত বের করা যায়। যেমন ধরুন, 'রোগী কখনও হাসছে আবার কখনও কাঁদছে'—বলে আত্মীয় স্বজন অভিযোগ করলেন। কোনও সন্দেহ নেই যে লক্ষণটি মানসিক। কাজেই, এ লক্ষণে কী কী ঔষধ হতে পারে তা খুঁজতে হলে আপনাকে 'মন' বিভাগটি খুলতে হবে। এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা চাই; রোগারা বা তাদের আত্মীয় স্বজনেরা কখনই কেতাবী ভাষায় কথা বলে না। তারা রোগের বর্ণনা দেয় তাদের নিজেদের ভাষাতেই, এবং স্ব স্ব উপলব্ধি-বিচার বুদ্ধিমত। ফলে, অবৈজ্ঞানিক ভাষা সত্ত্বেও তাদের মনের কথা, তাদের কষ্টের কথা—চিকিৎসকের নিকট যথার্থভাবেই ধরা পড়ে। সরল অশিক্ষিত রোগীরা

যে ভাষায় তাদের বিবরণ দেয় তা থেকে রোগের যথার্থ চিত্রই আঁকা যায়। এই সব রোগীরা গলায় ব্যথা হয়েছে, ডান দিকে ব্যথাটা বেশী; ঢোক গিললে কাঁটার মত বেঁধে, গরম কিছু খেলে আরাম পাই বলে; এ থেকে ঔষধটা চেনা যায় সহজে। কিন্তু এমন সব পণ্ডিতম্মন্য শিক্ষিত ব্যক্তিও থাকেন, যাঁরা নিজের রোগের বর্ণনায় পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে, আমাদের বিপদে ফেলেন; তাঁরা সেক্ষেত্রে বলে বসেন—"ডাক্তারবাবু, আমার গলার টন্‌সিলটা বেড়েছে; আমি আয়না দিয়ে দেখেছি; দেখুন আমায় এমন একটা ওষুধ দিন যাতে ওটা কমে যায়, তা হলেই ব্যথা-বেদনা সব চলে যাবে।" এই সব রোগীদের চিকিৎসক স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, তারা যেন তার কষ্টের কথাটা বলেন, বাকি সব চিকিৎসক নিজে দেখে বুঝবেন। তাই বলছিলাম, রোগীরা যে ভাষায় তাদের বক্তব্য প্রকাশ করে, সেটা কেতাবী ভাষা নয়, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা তো নয়ই। কিন্তু লক্ষণকোষ যাঁরা ঘাঁটেন, তাঁরা জানেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর ভাষার হুবহু প্রতিধ্বনি লক্ষণকোষে থাকে না; যদিও তার ভাষার মর্মবাণী যথাযথভাবেই লক্ষণকোষে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা আবার পূর্বলক্ষণটিতেই ফিরে আসি। **রোগী কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে।** লক্ষণকোষের ভাষায় এটি কোথাও খুঁজে পাবেন না। **লক্ষণকোষে** ঐ লক্ষণটিকে **ভাষান্তরিত করা হয়েছে** এইভাবে **পর্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন**। এবার আপনি বুঝেছেন যে, লক্ষণটি মানসিক

হওয়ায়, মন বিভাগের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে হয় হাস্য লক্ষণটি নয় ক্রন্দন লক্ষণটি বার করতে হবে। এবার বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে উক্ত হাস্য বা ক্রন্দন লক্ষণের পর্যায়ক্রমে কথাটি বার করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে যে সব লক্ষণ আছে, তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন লক্ষণটিও নিশ্চিত খুঁজে পাবেন। যেমন ডাঃ কেন্টের লক্ষণকোষের ৭১ পৃষ্ঠায় (ইংরেজি পুস্তকে)—হাস্য (laughing)—মোটা হরফে লেখা আছে, বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে খুঁজলেই ওটি পাবেন ; এবার উক্ত বিন্যাসানুযায়ী পর্যায়ক্রমে (alternating) দেখবেন লেখা আছে—

alternating with frenzy
groaning ;
loathing ; ইত্যাদি ;

এইভাবে—alternating with weeping অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ক্রন্দন খুঁজে পাবেন। অবশ্য আমরা ক্রন্দন লক্ষণটিও বের করতে পারি বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী: পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩-এ লেখা আছে—alternating with cheerfulness-লক্ষণের বিভিন্ন ঔষধাবলী। কাজেই রোগীর ভাষা থেকে লক্ষণকোষের ভাষার প্রভেদটুকু ঘোচাতে হবে, তারপর কোথায় তাকে পাওয়া যাবে বর্ণানুক্রমিক-বিন্যাসে, তাই আমাদের বের করতে হবে যত্ন সহকারে। নচেৎ, ভাষার গোলমালে এবং বর্ণের বিপর্যয়ে, চিকিৎসকের মনে লক্ষণকোষের প্রতি আস্থা যাবে কমে।

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস ছাড়াও আর এক ধরনের শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়েছে। এ বিন্যাসটিকে **লাক্ষণিক-বিন্যাস** বলা যায়। প্রত্যেক লক্ষণের **বিকাশ-সময়ের** কথা বলা হয়েছে **সর্ব-প্রথম**। অর্থাৎ কোন্ লক্ষণ কোন্ সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত অথবা হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে কথাই বলা হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই—লক্ষণকোষের প্রথম লক্ষণ থেকে শেষের লক্ষণটি পর্যন্ত। **তারপর বলা হয়েছে** সেই লক্ষণের **অবস্থা**—বর্ণসূচীর ক্রমানুসারে। অর্থাৎ, প্রত্যেক লক্ষণের অবস্থাগত হেরফের কি হয়, সেই কথাই বলা হয়েছে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে।

লক্ষণাবলী বিন্যাসকরণের মূল কথাগুলি স্মরণ রেখে, এবার লক্ষণকোষের 'আগপাশতলা' ঘুরে ফিরে দেখা যাক কেন্টের রহস্যভেদ করা যায় কিনা। মনের কথা বলা হয়েছে সর্বপ্রথম, তারপর—

শিরোঘূর্ণন—এই অধ্যায়ে মাথা ঘোরার বিভিন্ন সময়, অবস্থা ও হ্রাস-বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে।

মস্তক—অধ্যায়ে কেশ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। ব্যথা-বেদনার গতি প্রকৃতি যেমন,—দ্রুত বা ধীরে বেদনার হ্রাস-বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।

চক্ষু—অধ্যায়ে দৃষ্টি সম্পর্কেও একটি উপ-অধ্যায় আছে।

কর্ণ—অধ্যায়ে যাবতীয় স্রাবাদি, বেদনার কথা থাকলেও শ্রবণ-শক্তির জন্য একটি আলাদা অধ্যায় লিখিত হয়েছে।

নাসিকা—অধ্যায়ে ঘ্রাণ সম্পর্কিত লক্ষণগুলিও বলা হয়েছে।

মুখগহ্বরে—**জিহ্বা** বিশেষ স্থানাধিকার লাভ করেছে। কিন্তু দন্তের জন্য পৃথক অধ্যায় দেওয়া হয়েছে।

গলাভ্যন্তরে—পাওয়া যাবে টনসিল, ইউভিউলা, ইসোফেগাস।

গলা—বহিরংশের জন্য একটি পৃথক অধ্যায়, সেখানে সার্ভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ড (cervical gland) ও থাইরয়েডের (thyroid) কথা আছে। অতঃপর—

পাকস্থলী—এই অধ্যায়েই কয়েকটি **অতি প্রয়োজনীয় সার্বাঙ্গিক লক্ষণের** উল্লেখ আছে। **খাদ্যে ইচ্ছানিচ্ছা এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা** বিষয়ক লক্ষণগুলি এই অধ্যায়েই বিধৃত।

উদর—অধ্যায়ে যাবতীয় ঋতুস্রাবজনিত বেদনার পরিচয় পাওয়া যাবে। উদরের ও পাকস্থলীর বেদনার পার্থক্যনির্ণয় করা কঠিন; তাই এসব ক্ষেত্রে উদরের বেদনাতেই উভয়ের অনুসন্ধান করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মলদ্বার—অধ্যায়ে উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বেগসম্পর্কিত লক্ষণগুলি পাওয়া গেলেও মলের জন্য একটি পৃথক-অধ্যায় নির্দিষ্ট।

মল—অধ্যায়ে মলের প্রকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, সজোরে ইত্যাদি লক্ষণাবলীর উল্লেখ পাওয়া যাবে। এবার—

মূত্রযন্ত্রাদি—অধ্যায়ে পাঁচটি বিভাগ আছে; যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রস্রাবের বেগ, মূত্রাবরোধ ইত্যাদি

বিষয় 'মূত্রস্থলী' অংশে দ্রষ্টব্য ; মূত্রের বর্ণ, গন্ধ, পরিমাণ প্রভৃতি মূত্র অংশে পাওয়া যাবে।

জনন-যন্ত্রাদির জন্য দুটি অধ্যায় পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে তার বর্ণনা। মাসিক-সম্পর্কিত বহু সার্বাঙ্গিক লক্ষণই এখানে পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে ঋতুস্রাবকালে রোগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলে সার্বাঙ্গিক অধ্যায়ে তার হদিশ মিলবে।

এবার আবার **গলাভ্যন্তর** বেয়ে **শ্বাসযন্ত্রাদির** কথা বলা হয়েছে। প্রথমে প্রয়োজনীয় যন্ত্র থেকে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রে, প্রথমে অন্তরঙ্গের কথা পরে বহিরঙ্গের, প্রথমে বিস্তারিত সার্বাঙ্গিক শেষে অতি স্বল্পতম আঙ্গিক লক্ষণের কথা—প্রথমে **উর্ধ্বাংশের**, পরে **নিম্নাংশের** গুরুত্ব—এই হলো ডাঃ কেন্টের রেপার্টরির মর্মকথা এবং সেইভাবেই তার লক্ষণ-সন্নিবেশ, যেমন—

স্বরনালী ও শ্বাসনালী

শ্বাস-প্রশ্বাস

কাশি

নিষ্ঠিবন এবং তারপর **বক্ষোদেশের** কথা—যার মধ্যে **হৃৎপিণ্ড** ও **ফুসফুস**-যন্ত্রের লক্ষণাদি বিধৃত। পরে—

পৃষ্ঠদেশ এবং আর একটি বিরাট অধ্যায়ে **হস্তপদাদি**।

অতঃপর **নিদ্রা** অধ্যায়, যার মধ্যে **স্বপ্নের** কথাও লিপিবদ্ধ। পরে, **জ্বর, শৈত্য, ঘর্ম** পৃথক পৃথক অধ্যায় ; এবং তারপর **চর্ম** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং শেষ অধ্যায় হলো **সার্বাঙ্গিক**।

আমরা লক্ষণকোষের ধারাবাহিকতাটি জানবার পর পুনরায় লক্ষণাবলীর বিন্যাস-ক্রমে ফিরে আসা যাক। আমরা আগেই বলেছি প্রত্যেক লক্ষণের বিন্যাসে প্রথমে সময়, পরে অবস্থাদির কথা বলা হয়েছে। যেমন—উদাহরণস্বরূপ মাথায় ভারবোধের কথা ধরা যাক। প্রথমে—সময়……মাথায় ভারবোধ ; প্রাতে, বৈকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে ইত্যাদি ; তারপর—অবস্থা……খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডা বাতাসে, মনের প্রফুল্লতার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে, সিঁড়িতে উঠবার সময় ইত্যাদি। কাজেই, এই সময় অবস্থা এবং ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে, স্থান, গতি-প্রকৃতি, হ্রাসবৃদ্ধির লাক্ষণিক-বিন্যাস লক্ষণকোষের সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই।

ডাঃ কেণ্ট মনের কথা সর্বপ্রথম বলেছেন ; কিন্তু গুরুত্ব হিসাবে সার্বাঙ্গিক লক্ষণকেও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন—মনের পরেই। যদিও তিনি সার্বাঙ্গিক লক্ষণগুলিকে লক্ষণকোষের একেবারে শেষ বিভাগে ঠাঁই দিয়েছেন। আমাদের মনে হতে পারে যে, মনের পরেই সার্বাঙ্গিক লক্ষণের সূচী স্থির করা উচিত ছিল। কিন্তু শেষে দেবার কারণ কি। কারণ, অতি সহজ। যাঁরা চিররোগের ক্ষেত্রে লক্ষণকোষের শরণাপন্ন হন বারংবার, তাঁরা জানেন যে, বেশির ভাগ রোগীতেই মন ও সার্বাঙ্গিক লক্ষণ নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। তাই মন আদিতে ওল্টানো যেমন সহজ, অন্তে তেমনি সার্বাঙ্গিক ; মাঝখানে তার স্থান হলে বারবার খুঁজে বের করতে কিছুটা সময়ও তো ফালতু যেতো,

—তাই শেষ পর্যায়ে সার্বাঙ্গিকের স্থান দেওয়াটা যুক্তি সঙ্গতই হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সার্বাঙ্গিক শ্রেণীতে কোন্ কোন্ লক্ষণের বিন্যাস করা হয়েছে? উত্তরে আমরা লক্ষণকোষের উক্ত বিভাগে দেখতে পাচ্ছি যে, সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধি এবং রোগীর সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্কের কথায় বিধৃত রয়েছে এবং এখানেও সেই একই শ্রেণীবিন্যাস।

প্রথমত **সময়** সম্পর্কে। রোগী সামগ্রিকভাবে কোন্ সময়ে অর্থাৎ প্রাতে বা রাত্রে, দ্বিপ্রহরে বা বৈকালে, দিন-রাত্রির কটার সময়ে খারাপ বা ভালো বোধ করে এবং সময়ের পর যথানিয়মে এখানেও **অবস্থার** কথা এসেছে। রোগীর সার্বাঙ্গিক অবস্থাগুলি সামগ্রিকভাবে কখন বাড়ে-কমে, সে কথা বলা হয়েছে সেই একই **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসানুযায়ী**। এতদংশেই, শীতাতপ বর্ষায়, স্নানের ফলে কিংবা নিদ্রা, আহার, চাপ দিলে বা নড়াচড়া করলে ইত্যাদি অবস্থায় সামগ্রিকভাবে রোগী যেমন বোধ করে সে কথাও বলা হয়েছে। এ-ছাড়া **প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনচয়ও** এইখানেই উল্লিখিত আছে। যেমন, ক্যান্সার, কেরিস (caries), শোথ, গনোরিয়া ইত্যাদি প্যাথলজিক্যাল অবস্থা। কতকগুলি **বিশেষ অবস্থার** কথাও বলা হয়েছে এখানে; যেমন, **ক্লান্তি, দুর্বলতা, ভারবোধ** এবং **বেদনার**—সামগ্রিকভাবে আসা-যাওয়া সম্পর্কে; তাদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ইত্যাদি। এখানেই আরও পাওয়া যাবে **মূর্ছা, তড়্কা**—লক্ষণের বিশেষ

বিশেষ অবস্থান্তরগুলিও। যেমন, জ্বরে তড়কা হলে—কখন (অর্থাৎ সময়) এবং কী ভাবে (অর্থাৎ কোন অবস্থায়) ওদের দেখা মিলবে, সে কথাও বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে যথাযথ বলা হয়েছে।

অবশ্য সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলীর কিয়দংশ আবার লক্ষণ-কোষের অন্যত্র বলা হয়েছে; লক্ষণকোষের কোথায় তাদের পাওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেই সব সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলী কি কি হতে পারে, তার হদিশ আমরা নীচে উল্লেখ করছি এবং কোথায় কোথায় তাদের পাওয়া যেতে পারে সে কথাও বলছি এখানে—

সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলী	যে বিভাগে পাওয়া যাবে
খাদ্য সম্পর্কে ইচ্ছানিচ্ছা	পাকস্থলী অংশে
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা	ঐ
মাসিক বা ঋতু সম্পর্কিত	জনন-যন্ত্রাদি,
প্রয়োজনীয় লক্ষণাবলী	স্ত্রী অংশে

এবার আর একটি বিষয়ে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন; যে সব সার্বাঙ্গিক-লক্ষণাবলী পাকস্থলী বা জনন-যন্ত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও, সার্বাঙ্গিক বিভাগেই শুধু পাওয়া যাবে তারা হলো—

(১) খাদ্য, পানীয় হতে এবং বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি হতে হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ক লক্ষণাবলী এবং (২) ঋতুস্রাব হেতু সামগ্রিকভাবে হ্রাসবৃদ্ধিজনিত লক্ষণাবলী।

ঋতুস্রাব-সম্পর্কিত লক্ষণাবলীর বাকি সব কিছু যে-যে যন্ত্রের অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত, সেই সব লক্ষণ পাওয়া যাবে সেই যন্ত্রগুলির অংশে; যেমন ঋতুস্রাব হেতু মাথা-বেদনা লক্ষণটি—মস্তক বিভাগে পাওয়া যাবে কিংবা ঋতুস্রাব কালে কাশি বা মল লক্ষণগুলি—কাশি বা মল বিভাগে পাওয়া যাবে।

এই ধরনের বিভাগ সর্বত্রই দেখা যাবে। সার্বাঙ্গিক লক্ষণের যেগুলি সামগ্রিকভাবে রোগীর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়, সেগুলি পাওয়া যাবে সার্বাঙ্গিক বিভাগে এবং যেগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি শরীরের অংশবিশেষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি পাওয়া যাবে—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে। কোথাও তারা উদরে, কোথাও মস্তকে, আবার কোথাও বা বক্ষে—এই ভাবেই ওরা—আঙ্গিক (particulars) লক্ষণের অঙ্গীভূত হয়।

লক্ষণকোষের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে—**বেদনা** লক্ষণটি। যারা লক্ষণকোষ ঘাঁটায় অনভ্যস্ত কিংবা লক্ষণ-কোষের সিংহদ্বারে যারা সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে, তাদের কাছে—বেদনা অংশটি রীতিমত বেদনাদায়ক। বাস্তবিক পক্ষে বেদনা লক্ষণে তারা কোনও সুবিধা করে উঠতে পারে না, গোলকধাঁধায় কেবলই ঘুরে ফিরে মরে। কিন্তু যাদের হাতে আছে গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার পথনির্দেশ, তাদের কাছে বেদনা কখনই বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে না, বরং অনেকক্ষেত্রেই রোগীর বেদনা-বিদূরক হয়ে ওঠে।

আমরা জানি যে, **সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ** কাকে বলে ; যে সব লক্ষণের (ক) **অবস্থান**, (খ) **অনুভূতি**, (গ) **হ্রাসবৃদ্ধি**, এবং (ঘ) **সহচর লক্ষণ** থাকবে, তাকেই আমরা সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ বলি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে—'সহচর-লক্ষণের নীতি' অধ্যায়ে। তাই, এখানে সবিস্তার আলোচনা না করেও বলা যায় যে অন্য সব লক্ষণের কোথাও একটি আবার কোথাও বা একাধিক অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বেদনা লক্ষণের ক্ষেত্রে প্রায়শই তার সম্পূর্ণাঙ্গ-রূপটি ধরা পড়ে ; অর্থাৎ প্রত্যেক বেদনাজাতীয় লক্ষণের অঙ্গ-বিশেষ জুড়ে, কখনও বা সর্বাঙ্গ জুড়ে তার একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে। দ্বিতীয়ত, বেদনা মাত্রেরই অনুভূতি থাকে—তবে কোথাও কোথাও রোগী সেই অনুভূতিকে সঠিক ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। তৃতীয়ত, প্রায় ক্ষেত্রেই বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং সহচর-লক্ষণ হিসাবে বেদনার সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণেরও একটা সম্বন্ধ থাকে। তাই বেদনা লক্ষণগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণাঙ্গ হয় এবং সম্পূর্ণাঙ্গ হয় বলেই লক্ষণকোষের মধ্যে ওদের বিস্তৃতি এত ব্যাপক।

এবারে লক্ষণকোষ মধ্যে বেদনাকে কি ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে দেখা যাক। প্রথমে বেদনার অবস্থান বলা হয়েছে ; তাই সার্বাঙ্গিক স্তরেও যেমন বেদনার স্থান নির্দেশ করা আছে, তেমনি আবার আঙ্গিক স্তরেও। আঙ্গিক স্তরে বেদনার অবস্থান বলতে—শরীরের যে কোনও অংশে বেদনার স্থিতি বুঝতে হবে। কখনও মাথায়, কখনও বুকে,

আবার কখনও বা পেটে-হাতে পায়ে—বা যে কোনও যন্ত্রে যেমন, হৃৎপিণ্ড, লিভার, ইত্যাদি স্থানেও বেদনার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

বেদনা যদি সার্বাঙ্গিক হয়, তবে তার লক্ষণকোষে কী ভাবে সাজানো হয়েছে লক্ষ্য করুন। প্রথমে—

অবস্থান—সার্বাঙ্গিক অবস্থান—যেমন, অস্থিতে অথবা সাধারণভাবে সর্বত্র (লক্ষ্য করবার বিষয় অস্থি বা গ্ল্যাণ্ডের বেদনা সার্বাঙ্গিক পর্যায়ে ধরা হয়েছে)

অনুভূতি—কাটাছেঁড়ার মত অথবা চাপবোধ ইত্যাদি—এখানেও আবার অস্থি ইত্যাদি অংশের সঙ্গে তার উল্লেখ আছে।

হ্রাসবৃদ্ধি—মাসিকের সময়, চাপ দিলে, ঝড়ো আব-হাওয়ায় ইত্যাদি।

এবং **সহচর-লক্ষণ** হিসাবে অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে তার সম্পর্কও লক্ষণীয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সার্বাঙ্গিক-বেদনার বিভাগীয় বিশ্লেষণে **অগ্রাধিকার পেয়েছে সময়**, তারপর **অবস্থা** ইত্যাদি, যা আমরা লক্ষণকোষের সর্বত্রই লক্ষ্য করে আসছি।

এবার বেদনার আঙ্গিক বা স্থানীয় ক্ষেত্রে কী ভাবে তাকে সাজানো হয়েছে দেখা যাক। বেদনার স্থানীয় ব্যাপকতা হিসাবে হস্তপদাদির বেদনা সর্বাধিক। রেপার্টরি বিশেষজ্ঞ ডাঃ টাইলার বলেছেন—হস্তপদাদির বেদনা

প্রায় ১২০ পাতা জুড়ে আছে। তাই, উদাহরণ হিসাবে হস্তপদাদির আঙ্গিক বা স্থানীয় বেদনা আদর্শস্থল। এখানেও বেদনার সার্বাঙ্গিক প্রকাশের কথা প্রথমে বলা হয়েছে—তার **সময় সূচী** সর্বাগ্রে, তারপর **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অবস্থাগুলি**—যেমন, মাসিকের সময়, চলাফেরার কালে, বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে, শীতাতপ বর্ষায় ইত্যাকারে।

তারপর বেদনার **স্থানীয় প্রকাশানুযায়ী**—যেমন, অস্থি, পেশী, সন্ধি, নখ ইত্যাদির বেদনার বিশেষত্ব অনুযায়ী প্রথমত, **সময়**, তারপর **পরিবর্তনশীল অবস্থা** অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার কেন্টের নীতি অনুযায়ী চিকিৎসাকালে আমরা উপর হতে নীচে (above downwards) লক্ষণের যে বিন্যাস তাকে অগ্রাধিকার দিই ; তাঁর লক্ষণকোষেও প্রথমত ঊর্ধ্বাঙ্গের পরে নিম্নাঙ্গের লক্ষণাবলীর কথা বলা হয়েছে। তাই বেদনার অবস্থান বর্ণনাতেও প্রথমে **ঊর্ধ্বাঙ্গের** বা হস্তাদির, এবং পরে **নিম্নাঙ্গের** বা পদাদির লক্ষণ লেখা হয়েছে। **দক্ষিণ অঙ্গের কথা** প্রথমে, পশ্চাতে **বাম অঙ্গের** ; প্রথমে বেদনা বিকাশের বা বৃদ্ধির **সময়**, তারপর **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসানুযায়ী অবস্থার** কথা এবং শেষকালে **বেদনার গতি-প্রকৃতি**। সামগ্রিক ভাবে ঊর্ধ্বাঙ্গের কথা শেষ করে, ঊর্ধ্বাঙ্গের বিভিন্ন অংশের—স্কন্ধদেশ, বাহু, অগ্রবাহু, হস্ত, অঙ্গুলি, নখ ইত্যাদির বেদনাদায়ক লক্ষণাবলী—পূর্ববৎ বিন্যাসানুযায়ী—

অর্থাৎ প্রথমে **সময়**, পরে **অবস্থাদি** (বর্ণানুক্রমিক) এবং শেষে—**গতি-প্রকৃতির** হদিশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিম্নাঙ্গেরও বেদনার বিন্যাস করা হয়েছে।

অবস্থান অনুযায়ী বিন্যাস শেষ করে ডাঃ কেণ্ট বেদনার অনুভূতির কথা বলেছেন। এই অনুভূতিজ্ঞাপক লক্ষণগুলি বহুব্যাপক। এই অনুভূতির বিভিন্ন শিরোলেখ দেওয়া হয়েছে—যেমন, কর্তনবৎ, জ্বালাকর, চাপ দেওয়ার মত ইত্যাদি এবং এগুলির বিন্যাসকরণে সেই পূর্ব ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করা হয়েছে—

কর্তনবৎ, সামগ্রিকভাবে, সময় ও অবস্থাদি—

কর্তনবৎ বেদনা—অস্থিতে, সন্ধিতে, পেশীতে—

কর্তনবৎ বেদনা—ঊর্ধ্বাঙ্গে, সময়, অন্যান্য অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি ;

অতঃপর, কর্তনবৎ বেদনা—স্থানবিশেষে, প্রথমে ঊর্ধ্বাঙ্গে, পরে নিম্নাঙ্গে

—প্রথমে সময়, পরে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে অবস্থাদি এবং শেষে তার গতি-প্রকৃতি।

এইভাবে যাবতীয় অনুভূতির কথা সাজানো হয়েছে ; **প্রথমে বেদনার সামগ্রিক সার্বাঙ্গিকতা** থেকে **ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম আঙ্গিক** বা **স্থানের** মধ্যে তার **সময়**, বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে বিভিন্ন **অবস্থাদি** এবং শেষে তার **গতি-প্রকৃতির** কথা। কোথাও এর একটুকু ব্যতিক্রম নেই। এই হলো ডাঃ কেণ্টের লক্ষণকোষের বৈশিষ্ট্য।

বেদনা যে কোনও অঙ্গেই প্রকাশিত হোক না কেন, তার প্রকাশের ধারা সেই একই ভাবে উল্লিখিত—

প্রথমে সামগ্রিক বেদনার কথা—তার সময় ও অবস্থাদি (বর্ণানুক্রমিক) উল্লেখসহ।

পরে, স্থানীয় বেদনার কথা—সময়, অন্যান্য অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি, অতঃপর সামগ্রিকভাবে বেদনার অনুভূতি—সময়, অন্যান্য অবস্থা; গতি-প্রকৃতি। তারপর অংশবিশেষে বা স্থানবিশেষের অনুভূতি—ঐ একই বিন্যাসে।

কাজেই, বেদনা আর আমাদের নিকট ততখানি বেদনা-দায়ক হবে না, বরং লক্ষণকোষ সাহায্যে বেদনা হয়ে উঠবে বেদনা-নিবারক।

মোটামুটিভাবে এই হলো লক্ষণকোষের সবিস্তার পরিচয়। এবার আমরা লক্ষণকোষ ব্যবহার করবার পথ খুঁজে পাব সহজেই। এজন্য লক্ষণকোষ ব্যবহারের বিষয়ে আর একটু বলা প্রয়োজন। রোগী আর লক্ষণকোষের মধ্যে থাকে একটা দুস্তর ব্যবধান। লক্ষণকোষ একটি সমুদ্রবিশেষ; এক কথায় ঔষধ-বারিধি। আর রোগী হলো একটা বদ্ধ জলা। উভয়ের মধ্যে কোনও যোজক নেই। কিন্তু পয়ঃপ্রণালী কেটে যেমন জলার বদ্ধ জল সমুদ্রে টেনে ফেলা যায়, তেমনি একটা প্রণালীপথ তৈরি করার দরকার হয় রোগি-লক্ষণ-কোষের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে। এই প্রণালীপথ বেয়ে চিকিৎসক যেমন লক্ষণকোষের মধ্যে থেকে ঔষধ বাছাই করতে পারেন, তেমনি আবার অন্যদিকে অতীত লক্ষণের

হদিশ, বর্তমান লক্ষণাবলীর পরিচয় এবং অনাগত লক্ষণাবলীর বিষয়েও জেনে থাকেন।

লক্ষণকোষ-ব্যবহারতত্ত্বের মূলে ডাঃ হ্যানিম্যানের বাণীটিই কার্যকরী; তিনি বলেছেন যে আমরা রোগীর ঔষধ নির্ণয় করি, তার কোনও অঙ্গবিশেষের জন্য নয়। কাজেই লাক্ষণিক-সামগ্রিকতা গঠনই চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য, যার গঠনসৌকর্যের ওপরেই লক্ষণকোষ ব্যবহারের পথ হবে সহজগম্য। সেই সহজগম্য পথের সন্ধান পেতে হলে গাণিতিক-পদ্ধতিটি যে কী, তদ্বিষয়ে সম্যকজ্ঞান থাকা চাই।

তৃতীয় অধ্যায়

গাণিতিক-পদ্ধতি

শাস্ত্র যদি বড়ো হয়, তবে ভুল ঘটবার সম্ভাবনাও বেশী। যে মনন শক্তি হলে সেই শাস্ত্রের প্রত্যেকটি ধারাকে মুঠোর মধ্যে রাখা যায়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নিত্য-প্রয়োজনে নির্ভুলভাবে খাটানো যেতে পারে, সে হচ্ছে সাধনার ধন। কিন্তু শাস্ত্রের পরিধি যেখানে মানুষের আয়ু-ষ্কালকে ছাড়িয়া চলেছে, নিত্য নূতন ধারাবাহিকতায়, সেখানে একক জীবনে তার নাগাল পাওয়া যায় না, সিদ্ধিলাভও হয় না। তাই একক-জীবনে সেই পরিধির প্রান্তে পৌঁছতে হলে, চাই একটা সহজ-সুগম পথ। নইলে কেন্দ্র থেকে যোগাযোগ রইবে না, ব্যবহারিক প্রয়োগেও একটা অচলায়-তনের সৃষ্টি করবে।

হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের বিষয়েও কথাগুলি খাটে ; শাস্ত্রটি যেমনি বিরাট, তেমনি দুরায়ত্তকর। এখানে সাধনা যেমন প্রয়োজন, তেমনি নির্ভুল পথেরও। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক-খানি জুড়ে রয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োগবিদ্যা। হোমিওপ্যাথিক প্রয়োগ-বিজ্ঞান গণিতের মতই নির্ভুল। গাণিতিক নিয়মে সমান থেকে সমান বিয়োগ করলে, বাকি থাকে শূন্য অর্থাৎ কিছুই না। হোমিওপ্যাথিতেও ঔষধ-লক্ষণ ও রোগ-লক্ষণ

সমান হলে, সেই ঔষধ-প্রয়োগে দেখতে পাই, কী ঔষধ-লক্ষণ, কী রোগ-লক্ষণ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এখানে চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা চাই সমীকরণে।

কিন্তু সমীকরণ জ্ঞানটুকুই সব নয়, যদি না মেটিরিয়া মেডিকায় দখল থাকে পুরোদস্তুর। মেটিরিয়া মেডিকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঔষধের ভীড় বেড়ে চলেছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ঔষধকে চেনা ও মনে রাখা যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি প্রয়োজনের তাগিদে নির্ভুল বাছাই করাও প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই বাধা এড়িয়ে চলবার একটা সহজ অথচ নির্ভুল পন্থা বের করেছেন ধীমান্ চিকিৎসকের দল। হোমিওপ্যাথিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের এই পন্থাটিকে বলে art of repertorising, বাংলায় বলা যেতে পারে ঔষধ বাছাই বিদ্যা। বাছাই-বিদ্যাটি জানা থাকলে ঔষধ যেমন নির্ভুল হয়, রোগও নিরাময় হয় তদনুরূপ।

বাছাই-বিদ্যার মূলে আছে লক্ষণসমষ্টি; কারণ, সুসংবদ্ধ লক্ষণসমষ্টিই হল রোগার্তের ভাষা। কতকগুলো আবোল-তাবোল শব্দে যেমন মনের ভাব প্রকাশ হয় না, তেমনি অসংবদ্ধ-লক্ষণরাজিও রোগার্তের অবস্থাটি ব্যক্ত করে না। তাই লক্ষণাবলীর মূল সুর হচ্ছে সুসংবদ্ধতা। এখানে অল্প কথায় কাজ হয় অনেকখানি – যদি মূল সুরটুকু বজায় থাকে। নইলে, রাশি রাশি লক্ষণ সঞ্চয় করলে পুঁথি হয়তো ভরবে, কিন্তু মূল সুরটুকু যাবে হারিয়ে।

সুসংবদ্ধ লক্ষণ-সঞ্চয়ের পরে সেগুলিকে বাছাই করা

দরকার। ডাঃ কেন্টের বাছাই পদ্ধতি বড়ো চমৎকার। তিনি রোগীর লক্ষণসমষ্টিকে দুটো বিরাট গোষ্ঠিতে ভাগ করেছেন। একটা গোষ্ঠিকে বলেছেন ব্যাপক-লক্ষণ (general symptom), আর একটাকে স্থানীয়-লক্ষণ (particular symptom)। স্থানীয়-লক্ষণের চেয়ে ব্যাপক-লক্ষণের মূল্য বেশী ; এদের মূল্য যাচাই হয় রোগীর অবস্থা নিয়ে, তা রোগটি যাই হোক। কারণ, হোমিওপ্যাথির মর্মবাণী হচ্ছে, "রোগীর চিকিৎসা কর, রোগের নয়"। তাই, ব্যাপক-লক্ষণ-সমষ্টি রোগীর অন্তর-বাহিরে ছড়িয়ে থাকে, জানিয়ে দেয় রোগীর বিশেষত্ব কোথায়। কিন্তু স্থানীয়-লক্ষণসমষ্টি থেকে ধরা পড়ে অঙ্গবিশেষের বিপর্যয়। সে গোটা মানুষটার কথা বিবেচনা করে না, তার এলাকাটুকুর কথাই সে জানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ব্যাপক-লক্ষণগুলো যেন গোটা দেশটার খবরাখবর, দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে ছড়ানো হচ্ছে ; তা শুনে, রাষ্ট্রের অবস্থাটা বুঝতে দেরী হয় না ; সে খবরগুলোর উপর নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। কিন্তু স্থানীয় খবরে কেবল বুঝি, সেই স্থানেরই অবস্থাটুকু। কিন্তু সেখানকার অবস্থা বুঝলে ত শুধু চলবে না, বুঝতে হবে গোটা দেশটার অবস্থা। নইলে পদে পদে ভুল হবে, অরাজকতা বাড়বে, শান্তি মিলবে না কোথাও !

ব্যাপক ও স্থানীয়-লক্ষণ বাছাই করবার একটা সহজ উপায় বাতলানো হয়েছে। রোগী যেখানে গোড়ায় 'আমি' উত্তম পুরুষটি দিয়ে কোন একটি লক্ষণ বলবে, তখন সেটি হবে

ব্যাপক ; আর যদি 'আমার' শব্দটি দিয়ে কোন লক্ষণ প্রকাশ করে, তবে সেটা পড়বে স্থানীয় লক্ষণের পর্যায়ে। দুটো উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা সোজা হবে। ব্যাপক-লক্ষণের ভাষা হবে যেমন "আমি শীতকাতর," "আমি ভাবছি, জীবনটা বুঝি বৃথাই গেল," "আমি দুধ খেতে ভালবাসি"—এমনিতরো আমি বা আমি বাচক শব্দ দিয়ে হবে এর গোড়া পত্তন। কিন্তু স্থানীয়-লক্ষণ প্রকাশ করতে রোগী বলবে, "আমার কোমর বেদনা করছে", "আমার ঘা-টার রস চট্‌চটে", "আমার বুকটা ধড়্‌ফড়্‌ করছে" ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণ পরিচয়ের একটা বাঁধা গৎ খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, এদের যাচাই করতে হবে বিচারবুদ্ধি দিয়ে, কোন বাঁধাধরা রুটিনে নয়।

ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণ চেনবার যে সহজ পথের কথা বললাম, মাঝে মাঝে তারাই আবার বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। রীতিমত ধাঁধাঁয় ফেলে দেয়—কোন্‌টা কি, ভাবতে একটু বেগ পেতে হয়। যেমন, **আর্সেনিক** শীতকাতর ; শুধু তাই নয়, শীতকাতুরে ঔষধগুলির মধ্যে অগ্রজ। কিন্তু মজা হচ্ছে, এই আর্সেনিকের রোগেই আবার মাথা বেদনায় চায় ঠাণ্ডা জল, ঠাণ্ডা হাওয়া। গোটা গা ঢাকা রইবে, কিন্তু মাথাটি রইবে খোলা—কোন ঢাকা রাখতে পারবে না সেখানে। ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু মাথায় এনে দেবে শান্তির প্রলেপ। আবার **লাইকোর** কথা ভাবুন। গরম তার পক্ষে অসহ্য ; কিন্তু তার পেটের পীড়া উপশম হবে গরম খাদ্যে, গরম পানীয়ে।

এই দুটো লক্ষণ একই ঔষধে বিপরীতধর্মী। কিন্তু তবুও তাদের আসল পরিচয় পেতে হলে, সেই আমি ও আমার শব্দ দুটির সংযোজনা প্রয়োজন। প্রথমটি প্রকাশের বেলায় রোগী বলবে, আমি শীত মোটেই সহ্য করতে পারি না (এটি একটি অমূল্য ব্যাপক-লক্ষণ)।

কিন্তু আমার মাথার যন্ত্রণায় ঠাণ্ডা জল বা খোলা হাওয়া বেশ ভালো লাগে (স্থানীয়-লক্ষণ)। রোগীটি আর্সেনিকের। আবার লাইকোর রোগী হলে বলবে, 'ভয়ানক গরম-খাবার টাবার খেলে আমার পেটের যন্ত্রণা অনেকখানি কমে যায়' (স্থানীয়-লক্ষণ)। এদের পরিচয় ও বাছাই-রীতি হবে এমনিতরো।

আমরা জানি **ফসফরাসের** রোগী শীতকাতর। ঠাণ্ডায় তার বৃদ্ধি, কিন্তু সে পেটের পীড়ায় চায় ঠাণ্ডা জল আর বরফ। অদ্ভুত লক্ষণ নয় কী এটা? রোগী ব্যাপক-ক্ষেত্রে একেবারে ঠাণ্ডার বিরোধী, কিন্তু কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (পাকস্থলীতে) রোগী ঠাণ্ডার পক্ষপাতী; এখানে বরং ঠাণ্ডা জল পাকস্থলীতে বেশিক্ষণ থাকলে, গরম হয়ে বমি হয়ে যায়। কারণ গরম পানীয় পেটের মধ্যে রাখতে পারে না এক মুহূর্ত। **লাইকো** আর **ফসের** তুলনাটা লক্ষ্য করবার। ঠাণ্ডা আর গরমে দুজনেই অস্থির। তফাৎ কেবল—ঠাণ্ডা আর গরম সহ্য করবার ধর্মে। ফস—ব্যাপকভাবে শীতে অস্থির। লাইকো—গরমে। কিন্তু পেটের পীড়ায়, লাইকো চায় গরম, আর ফস চায় ঠাণ্ডা। এখানে এই পার্থক্যটা লক্ষ্য করবার মতো। প্রথম লক্ষণটি

ব্যাপক আর দ্বিতীয়টি স্থানীয়। এ ক্ষেত্রে গতানুগতিক-ভাবে লক্ষণকোষ (repertory) হাতড়ালে হবে না। বাছাই করার আগে প্রত্যেকের মূল্য যাচাই করতে হবে। তবেই নির্ভুল ও সহজ হবে আমাদের লক্ষণকোষ ঘাঁটা।

এখন ব্যাপক-লক্ষণ-সমষ্টিকে আবার কতকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির গুরুত্বের উপর। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যারা, তাদের বলা হল মানসিক-লক্ষণ ; ব্যাপক লক্ষণ-গোষ্ঠির মুখ্যকুলীন। এরা জানিয়ে দেয় রাজেন্দ্রিয়মনের রুগ্নাবস্থা, কতখানি কি পরিবর্তন ঘটিয়েছে সেখানে।

রোগীর মানসিক লক্ষণের যেগুলো খুবই পরিস্ফুট, যেগুলোর তলে লাল পেন্সিলে দাগিয়ে দেওয়া যায়, সেগুলো থেকেই অনেক সময় ঠিক ঔষধটি বাছাই করা চলে, যদি তাদের সংখ্যা বহুবচনে না হোক, কমপক্ষে হয় দ্বিবচনে। কিন্তু যদি তেমনতরো লক্ষণ নাই মেলে, যদি লক্ষণগুলো নামজাদা না হয়, তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। যে ২।৪টি মানসিক লক্ষণ পাওয়া যাবে, তা দিয়েই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। এখানেই প্রয়োজন হবে লক্ষণকোষের। লক্ষণকোষ খুলে, খুঁজে পেতে বার করতে হবে, কোন্ লক্ষণটির গায়ে রয়েছে কি কি ঔষধের নামাবলী। এমনি ভাবেই প্রত্যেকটি লক্ষণের খোঁজ নিতে হবে, লক্ষণকোষ থেকে বাছাই করতে হবে, নিয়ে আসতে হবে আমাদের খাতার পাতায়। কাজটি গোড়ায় শক্ত মনে হলেও, নির্ভুল অঙ্কের মতোই প্রত্যক্ষ-ফল পাওয়া যাবে

শেষের দিকে। একটু ধৈর্য, লক্ষণ-লিপিকরণে একটু দক্ষতা, লক্ষণকোষ ঘাঁটার একটু পরিশ্রম!—তবেই মিলবে সার্থকতা ও পারিশ্রমিক।

মানসিক লক্ষণের দিকে নজর দিতে গিয়ে দেখতে পাই ২।৩টি লক্ষণের বচন-ভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হলেও, মানেটার ইতর-বিশেষ থাকে খুব সামান্যই। কিন্তু বচন-ভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য, লক্ষণ দুটিতেও ঔষধ তালিকার ইতর-বিশেষ ঘটে। যেমন—লোকের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে, একলা থাকতে ভালবাসে না, অথবা অন্ধকারে ভয় পায়, আলোয় থাকতে পছন্দ করে। এখন লক্ষণকোষের সাহায্যে দেখা যাবে প্রত্যেকটি লক্ষণে ঔষধগুলি এক নয়; যে ঔষধগুলি দুটি লক্ষণেই পাওয়া যাবে, সেই কয়টি রেখে বাকিগুলি ছাড়লেও বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। এখানে যদি অমনি ধরনের একার্থক লক্ষণগুলি এক সঙ্গে ধরে তাদের ঔষধের তালিকা সংগ্রহ করা যায়, তবে কাজটা হবে সহজ অথচ নির্ভুল। কিন্তু অনেক সময় প্রায় বচন-ভঙ্গী এক রকমের হলেও, তাদের মানেটা হয় বিভিন্ন। যদি বলা যায়,—গোলমাল সইতে পারে না, আর, গোলমালে বৃদ্ধি—তবে তাদের রূপ এক হবে না কখনও। এখানে এদের বাছাই করতে হবে নিখুঁতভাবে, কোন ঔষধকে বাদ দেওয়া চলবে না কারো থেকে। এ সব ক্ষেত্রে যদি পূর্বের বাছাই-পদ্ধতি ধরা হয়, তবে অনেক সময় আসল ঔষধটি আমাদের বুদ্ধির চালুনি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে; তখন আর নির্ভুল হবে না আমাদের গাণিতিক ঔষধ-

প্রয়োগ-প্রণালী। মোট কথা প্রত্যেক লক্ষণটিকে বিচার করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে, তবেই সফল হবে এই বাছাই-বিদ্যা।

বাইরের জগতের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যে লক্ষণগুলো রোগীর সমস্ত দেহে ও মনে প্রকাশিত হয়, সেগুলির মূল্য দেওয়া হয়েছে মানসিক লক্ষণের পরেই। বাইরের জগতের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—বলতে কি বোঝায়, তা একটু খুলে বলা দরকার। মানুষ যে জগতে বাস করছে, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয় অনেকখানি। যারা খাপ খাইয়ে চলাটা সমঝে নিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে চলতে পারে, তারাই এখানে টিকে থাকবার যোগ্য; নইলে প্রকৃতির নিয়মে নিশ্চিহ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর কৌশলটুকু জানে বলেই আজ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব লোপ পায় নি। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃতির খেয়ালীপনায় এই মানুষকেই বিব্রত হতে হয়। মহামারী, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদিই হচ্ছে প্রকৃতির ক্ষ্যাপামি। প্রকৃতির এই ক্ষ্যাপামি বা খেয়ালীপনার সময় মানুষ তার খাপ খাওয়ানোর বিদ্যেটা চট করে কাজে লাগিয়ে উঠতে পারে না। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে হয়তো পারবে তার উন্নত বিদ্যা-বুদ্ধির বলে। এটা অবশ্য, কোন একটা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকের সময় মানবসমষ্টির খাপ-না-খাইয়ে চলতে পারার ফল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও এই খাপ-না-খাইয়ে চলার ঘটনা ঘটছে অহরহ। সেইগুলোর কথাই আমি বলছি।

কী দৈনন্দিন জীবনে, কী আচারে-ব্যবহারে, কী স্বভাবে-

অভাবে মানুষ ক্রমেই উন্মার্গগামী হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করছে প্রতি মুহূর্তে, ধর্মের ধ্বজা লুটিয়ে পড়ছে ধূলায়, স্বাভাবিক জীবন হচ্ছে ব্যাহত। সহজ সরল জীবনযাত্রায় মন আর ভরছে না, মনের মধ্যে জমে উঠছে নানানতরো আবর্জনা, আচারে-আচরণে এসেছে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলে মানুষ ভুগছে রোগযন্ত্রণায়, মানসিক ব্যাধিতে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই মৃত্যু ডেকে আনা। আমরা অহরহ দেখছি রুগ্ন ব্যক্তির বিবর্ণ মুখ, দেখছি তাদের উচ্ছৃঙ্খল-জীবনের পরিণাম। রোগের কারণ খুজতে গিয়ে অনেক সময় হয়তো দেখতে পাই, রোগী হয়তো শীতে বর্ষায় অনাবৃত দেহটাকে হিমেল আর সিক্ত হাওয়ার হাতে সঁপে দিয়েছিল,—পরিণামে ক্ষণভঙ্গুর দেহে বাসা বেঁধেছে শ্বাস-কাশ-সর্দি। আবার হয়তো অস্বাভাবিক কুচিন্তা, অতিরিক্ত মৈথুন, অখাদ্য-কুখাদ্য আহারের প্রতিক্রিয়ায় যে শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে একবার, তাকে বাগ মানাতে বেগ পেতে হয়।.....

.....কিন্তু আমি বলছিলাম, বহির্জগতের ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার ফলে যে লক্ষণসমষ্টি দেখা দেয়, তার কথা। রোগীর লক্ষণগুলি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, ঠাণ্ডায়-গরমে, দিন রাত্রির কোন্ সময়, কখন কী অবস্থায়, চলা-ফেরায়, শোয়া-বসায়, ঘুমিয়ে ও জেগে থাকার পর, কী পরিবর্তন হয়, তাই এখানে লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু এখানেও যেন এই লক্ষণসমূহ রোগী ও লক্ষণকোষের মধ্যে বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট থাকে; অর্থাৎ লক্ষণকোষের মধ্যে হয় বড় হরফে নয় তারকা-চিহ্নিত (*)

লক্ষণ যেন হয় এবং রোগীও যেন ওদের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলে, তবেই।

মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা যায় যে, রোগী এমন দুটি লক্ষণ বলছে যা শুনতে প্রায় একই রকম এবং দুটি হয়তো এতোই প্রয়োজনীয় যে, বাছাইকারী-লক্ষণ হিসাবে যে কোন একটির উপর নির্ভর করা চলতে পারে। কিন্তু ওরা যদি দুটি বিভিন্ন ঔষধ-নির্দেশক হয়, তবেই বিব্রতবোধ করেন চিকিৎসকের দল। এখানে দরকার, অন্যান্য লক্ষণের বাটখারায় যে ঔষধের পাল্লা ভারী হবে, তাকেই গ্রহণ করা এবং অন্যটিকে ত্যাগ করা।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপক-লক্ষণগুলি নিয়ে, আর দু-একটা কথা বলবো। রোগের বাড়া-কমা যে সব কারণের উপর নির্ভর করে, সেগুলিও এই পর্যায়ের। কিন্তু এই বাড়া-কমাটা যেন গোটা রোগীটাকে নাড়া-চাড়া দেয়, কোন একটি স্থানীয়-লক্ষণ বিশেষকে নয়। ঐটি মনে রাখতে হবে।

এবারে আর এক রকমের ব্যাপক-লক্ষণের কথা বলবো, যারা নির্ভর করছে রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ঔষধ-নির্বাচনে সাহায্য করে অনেকখানি। অন্তরের ভাষা হচ্ছে এই ইচ্ছা-অনিচ্ছা। রোগী কী চায় আর কী চায় না—বললে এটার স্বরূপ ফুটে উঠবে না। এটা এমনতরো হওয়া চাই, যাতে তার আগ্রহ সমস্ত চোখে-মুখে ভাষায় আন্তরিকভাবে প্রকাশ পাবে। আর যেটা সে একেবারে পছন্দ করে না, তাকেও যেন সে তার ভাবে ভাষায়

রূপ দেয় নিখুঁতভাবে। রোগীকে এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নটা এমনভাবে করতে হবে, যাতে তার জবাব মিলবে চট্‌পট্। বারংবার প্রশ্নের বেড়াজালে ফেলে তার জবাব আদায় করতে গেলে, রোগীর বিচার-বিবেচনার তুলাদণ্ডে যেটা বেরোবে, সেটা হয়তো ভুল হবে না কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া যাবে না কোন আন্তরিকতার সুর ; নিমরাজী কথার ফাঁকে, আমাদের বাছাইকরণেরও সুবিধা হবে না কোনো।

এর পরের লক্ষণসমষ্টি পাওয়া যাবে কেবলমাত্র মেয়ে রোগীদের বেলায়। তাদের রজঃস্রাব কালের লক্ষণগুলিই হচ্ছে চতুর্থ স্তরের ব্যাপক-লক্ষণ। কথা উঠতে পারে, রজঃস্রাব তো ব্যাপক-লক্ষণ নয়, ও তো একটা স্থানীয়-লক্ষণের বিকাশ মাত্র। ঠিক তাই। রজঃস্রাবের লক্ষণগুলি সবই স্থানীয়। কিন্তু রজঃস্রাবের পূর্বে, সময়ে ও পরে যে সব ব্যাপক-লক্ষণ-সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সেগুলিই এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য। একটা উদাহরণ দিলেই আর সন্দেহের অবকাশ রইবে না। সিমিসিফুগাতে রজঃস্রাব যত বেশী হয়, ততোই ব্যাপক-লক্ষণসমষ্টির বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ রোগীর কষ্ট বাড়ে। এক্ষেত্রে এটি একটি ব্যাপক-লক্ষণ। শুধু তাই নয়, মাসিক যদি অনেক আগে বা পরে, অথবা স্রাবের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং এর সঙ্গে ব্যাপক-লক্ষণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে, তবে এটিও মনে রাখতে হবে। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, জরায়ুর কোন দোষের জন্য ঐ অবস্থা কয়টির উৎপত্তি কি না। জরায়ুর দোষ বললে বুঝতে হবে, তার স্থানীয় গোলযোগ, অর্থাৎ অর্বুদ,

ঘা বা কোন প্রকার অস্বাভাবিক স্রাব ইত্যাদি। যদি তার থেকে 'মাসিক'-এর সময় বা স্রাবের পরিবর্তন হয়, তবে এক্ষেত্রে তার কোন মূল্য নেই।

এতক্ষণ যে সব লক্ষণের বিষয় বললাম, সবগুলিই ব্যাপক; এদের মূল্য যে বেশি বিশেষত চিররোগের বেলায়, এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের লক্ষণ বাছাই করবার সময় নজর রাখতে হবে এদের গুরুত্বের উপর। যে লক্ষণগুলি মূল্যবান, যাবা রোগীর ভিতর হতে উৎসারিত তাদের ঔষধের তালিকা বের করতে ঘাঁটতে হবে লক্ষণকোষ। লক্ষণকোষের যে ঔষধগুলি থাকবে বড়ো হরফে কিংবা তারকা-চিহ্নিত, তাদের মূল্য হবে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের। কিন্তু মনে রাখতে হবে লক্ষণ যদি প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের না হয়, তবে ঔষধগুলি ঐ স্তরের হলেও লাভ হবে না কিছু, বাছাই-বিদ্যাও হবে ভুল। লক্ষণ যেখানে নিম্ন স্তরের, সেখানে তার ঔষধও হবে ঐ স্তরভুক্ত—এতে বরং ফল দর্শাবে। কিন্তু নিম্নস্তরীয় লক্ষণের পাশে তারকা-চিহ্নিত বা বড়ো হরফের ঔষধে কাজ হবে নৈব নৈব চ। এ যেন হবে প্রাসাদের দ্বারোয়ানটাকে রাজপোষাকে রাজার আসনে বসানো।

এবারের কথা হচ্ছে স্থানীয়-লক্ষণ নিয়ে। স্থানীয়-লক্ষণ বলতে কী বোঝায়, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি; এবং তুলনামূলকভাবে ব্যাপকের সঙ্গে স্থানীয়ের পার্থক্য কতটুকু—সে কথাও বলা হয়েছে। আমাদের কাছে রোগী আসে তার স্থানীয়-লক্ষণের পশরা বয়ে। সে তার ব্যাপক-লক্ষণগুলির

দিকে খেয়াল করে না অতটা, যতটা স্থানীয়-লক্ষণের প্রতি খেয়াল করে। রোগী অভিযোগ জানায় তার মাথা, পেট বা অন্য কোন যন্ত্রের। ব্যথা, গোলমাল বা গোলযোগের ফিরিস্তি দেয় সে। এই সব অভিযোগের মাত্রা এত বেশী যে লক্ষণ-সমষ্টিও সময়ে সময়ে প্রচুর হয়ে পড়ে। রোগী যখন তার পীড়ার বর্ণনা দেবে, তখন ধৈর্য সহকারে তার কথাগুলি শুনতে হবে। কোন প্রশ্ন করা চলবে না তখন, শুধু মনোযোগ দেওয়ায় হবে কাজ। মাঝ থেকে জেরার পাল্লায় পড়ে তার খেই হারাবার সম্ভাবনা। তাই, এখানে ডাক্তার হবেন নীরব শ্রোতা, আর রোগী হবে একক বক্তা। এর ফলে তার কাছ থেকে লক্ষণসমষ্টি পাওয়া যাবে প্রচুর, যদিও তার বেশির ভাগই হবে স্থানীয়। সংখ্যাধিক্য হলেই যে তার মূল্য হবে বেশি, ভোটের জোরটাই যে জগতের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—এমন কিছু কথা নয়। এখানেও তাই। স্থানীয়-লক্ষণের প্রাচুর্য থাকলেও গুরুত্ব নাই; গুরুত্ব হবে ব্যাপকের উপর। এ কথা আগেই বলেছি; আবার বলছি। যদি রোগী আসে তার শ্বাসকষ্ট বা বাতের ব্যারাম নিয়ে, তবে তার চিকিৎসা করতে শ্বাসযন্ত্রে বা বাতগ্রস্ত দেহাংশের প্রাধান্য দিলে চলবে না। যদি তা করা হয়, তবে রোগ হয়তো সেই যন্ত্র বা অংশ ছেড়ে আর একটা যন্ত্রে তার আক্রমণ-নীতি চালাবে। বাত ভালো (?) হবে, কিন্তু হার্টকে করে দেবে অকর্মণ্য; এই হচ্ছে স্থানীয় লক্ষণমূলক নীতির কুফল। কিন্তু যদি সমস্ত রোগীটির উপর নজর রেখে চিকিৎসা করা

যায়, তা হলে বাত তো ভালো হবেই, আর সেই সঙ্গে রোগীর অন্যান্য বাতিকেরও হবে নিরসন। এমন কী রোগীর বর্ণনায় যে স্থানীয়-লক্ষণের কথা বলতে ভুল হয়েছিল, তারও আরাম হবে।

অবশ্য এটুকু ঠিক যে, রোগীর স্থানীয়-লক্ষণগুলিকে অবহেলা করা চলবে না,—তা পূর্বেই বলেছি। এদের সঞ্চয় করতে হবে যন্ত্রের সঙ্গে, আর বাছাই করতে হবে শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে। এক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলো আশ্চর্য, অদ্ভুত ও বিশেষত্বপূর্ণ, সেইগুলিরই মর্যাদা বেশি। যে বস্তুটা বিশেষত্বহীন, তার যেমন নেই কোনো আকর্ষণ, তেমনি একটা কিছু অপূর্বতা না থাকলে, সে লক্ষণেরই বা মূল্য রইবে কেন? স্থানীয়-লক্ষণের মাপ-কাঠিতে তারাই হবে বড়ো, যারা আনতে পারবে একটা বিস্ময়, একটা অপূর্বতা। এখানে দেহাংশের সঙ্গে বহির্জগতের প্রতিক্রিয়াটাই হবে দেখবার। মাথা, চোখ, হাত, পা, ফুসফুস, যকৃৎ ইত্যাদির লক্ষণরাজি, ঘরের ভিতরে, বাতাসে, ঠাণ্ডা জলে, আহারের পর, দিনে বা রাত্রিতে, নড়াচড়া ও অন্যান্য অবস্থায় কি কি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, এখানে তা লক্ষ্য করতে হবে; শুধু তাই নয়, তাদের বিশেষত্বই বা কোথায়, সেটাও বাছাই করতে হবে। যত সুন্দরভাবে খুঁজে বার করা যাবে এদের বৈশিষ্ট্য, ততোই সুবিধা হবে বাছাই-বিদ্যার।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বলতে কী বোঝায়, তারই একটু আভাস দিচ্ছি। আমাদের মতে সেটাই হবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যেটা রোগ-নির্দেশক লক্ষণরাজি থেকে বিভিন্ন; আর অন্যান্য

ঔষধগুলো যদি সেই লক্ষণটিতে দেউলিয়া হয়, তবে তার অধিকারী ঔষধটির মূল্য যাবে বেড়ে, ফলে লক্ষণটিও হবে অপূর্ব দুষ্প্রাপ্য ও বিশেষত্বপূর্ণ। এমনিতরো দেহজাত লক্ষণগুলিকে কৌশলে বার করতে হবে, লক্ষণকোষ থেকে নিয়ে আসতে হবে তাদের ঔষধের নামাবলী। লক্ষণকোষ ঘাঁটার কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে; এখানে দক্ষতা আনতে হবে লক্ষণকোষ উল্টানোর, নইলে সব বৃথা।

মোটামুটিভাবে ডাঃ কেন্টের ব্যাপক ও স্থানীয়-লক্ষণের মধ্যে কার প্রয়োজন কী, বোঝা গেল। কিন্তু এ ছাড়া আর এক রকমের লক্ষণ আছে, যাদের বলা হয় সাধারণ। সাধারণ লক্ষণগুলি হচ্ছে রোগ-নির্দেশক। বিশেষ বিশেষ রোগের সাধারণ-লক্ষণগুলি এক পর্যায়ের। এদের জানা থাকলে রোগ-নির্ণয়ের হয় সুবিধা, কিন্তু ঔষধ-বাছাই-এর বেলা এরা পঙ্গু। কারণ, এরা বিশেষত্বহীন, এদের স্বাতন্ত্র্যবোধ নেই। আবার এই সাধারণ-লক্ষণগুলিই মাঝে মাঝে নিজেদের মূল্য জাহির করে, হয়ে পড়ে অ-সাধারণ।

তৃষ্ণা একটি সাধারণ-লক্ষণ। জ্বর যখন খুব বেশী, তখন তৃষ্ণা থাকাটাই স্বাভাবিক। অতএব, এখানে তৃষ্ণা অস্বাভাবিকতা দাবী করতে পারে না বলেই, বাছাই-পদ্ধতিতে একে মর্যাদা না দিলেও চলে। শুধু জ্বরাধিক্যেই যে তৃষ্ণা মর্যাদা হারাবে তা নয়, আরও এমনি কতকগুলি কারণ আছে যেখানে ওর গুরুত্ব ধরে না কেউ। যেমন বহুমূত্ররোগে, গরম ঘরে

কিংবা ইঞ্জিন ঘরে কাজকরবার পর, রৌদ্রের রুদ্রতায় ইত্যাদি। কিন্তু জ্বর যেখানে প্রচণ্ড অথচ রোগীর তৃষ্ণা মোটেই নেই, সেখানে তৃষ্ণাহীনতা লক্ষণটি অবহেলার যোগ্য নয়। কারণ, এখানে পিপাসাহীনতা লক্ষণটি হয়ে দাঁড়ায় অসাধারণ। আবার যেখানে রোগীর জিব দেখতে ভিজে ভিজে, কিন্তু তৃষ্ণা আছে প্রচুর, যেখানে মার্কের এ লক্ষণটি পাওয়া যাবে, সেখানে তৃষ্ণা তার অসাধারণত্বের দাবীতে দাঁড়াতে পারে। ব্যথা-ফোড়াতে একটু চাপ পেলেই রোগী বোধ করবে অসোয়াস্তি, আর যন্ত্রণাও যাবে বেড়ে। কারণ সেটাই স্বাভাবিক। আবার গরম সেকে ঐ ফোড়ায় আরাম পাবে। যেহেতু, এটাও স্বাভাবিক। ওরা দুটোই সাধারণ-লক্ষণ। ওদের নিয়ে আমাদের কারবার চলবে না। ব্যথা, ফোড়ার ধর্মই হচ্ছে চাপ দেওয়াতে বৃদ্ধি আর গরমে হ্রাস। তবে যদি এমনতরো ফোড়া হয়, যেখানে অল্প চাপ দিলে কষ্ট বাড়লেও, বেশি চাপ দেওয়াতে আরাম, তবে ঐটি হবে একটি বিশেষ-লক্ষণ। চায়নাতে পাওয়া যাবে এর হদিশ। আর গরমের পরিবর্তে ঠাণ্ডা দিলে যে ফোড়াতে আরাম মিলবে, সেখানে লক্ষণটি হবে অসাধারণ। তাই, সাধারণ যে কখন অসাধারণ হয়ে দাঁড়াবে, তা যেন আমাদের দৃষ্টি না এড়িয়ে যায়। এমনিতরো অনেক সাধারণ-লক্ষণই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে তাদের অবস্থা-বিশেষে। তখন তাদের বাছাই-পদ্ধতির ভিতর সাদরে স্থান দিতে হবে, নইলে ক্ষয়-ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। বাকি যেসব লক্ষণ উঠতে পারবে না এই অসাধারণত্বে, লক্ষণকোষ ঘাঁটবার বেলায় তাদের ডেকে

এনে সময় ও শ্রমের হানি করে লাভ হবে না কিছুই। তাই এই সাবধান বাণী।

লক্ষণসঞ্চয়ের বেলায় রোগীর ব্যাধি-মন্দিরে কি কি উপচার আছে, শুধু তাই দেখলে চলবে না, কি কি নেই তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। যে লক্ষণ আছে, তা যেমন ঔষধ-বাছাই-এর বেলা দরকার, আর যা নেই তারও তেমনি। অর্থাৎ না-বাচক লক্ষণগুলি (negative symptoms) হচ্ছে এই শ্রেণীর। পালসের রোগী জল খেতে চায় না, সালফারের শিশু গায়ে কাপড় রাখতে চায় না; এদের এই না-চাওয়াটাই এখানে লক্ষণ।

হোমিওপ্যাথিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানে দক্ষতা আনতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লক্ষণকোষ ঘাঁটায় দক্ষতা। কিন্তু এই লক্ষণ-কোষ বস্তুটি এত বিরাট যে, এর সহজ পথটা না জানা থাকলে, এতে ডেকে আনবে বিফলতা। সেই সহজ পথটা দেখানোই হচ্ছে এই লেখাটার উদ্দেশ্য। এতক্ষণ বললুম, লক্ষণকোষের প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলিকে যাচাই ও বাছাই করবার প্রণালী। সে কাজটি যখন হল সহজসিদ্ধ, তখন নজর এলো লক্ষণকোষের পাতায়; কিন্তু সেখানে প্রত্যেকটি লক্ষণের পাশে যে অজস্র ঔষধের নামাবলী আছে, তার থেকে ঠিক ঔষধটি বাছাই করা রীতিমত দুরূহ কার্য। কিন্তু ঔষধের এই নামাবলীকে ক্ষয়িয়ে আনবার একটা নতুন কৌশল বার করলেন দুজন অধুনা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, একজনের নাম ডাঃ জন উইয়ার আর একজন হলেন ডাঃ মার্গারেট টাইলার। তাঁরা একজাতীয়

লক্ষণের নাম দিলেন "বাছাইকারী"। এই বাছাইকারী লক্ষণের কাজ হল, প্রথম থেকেই ঔষধের সংখ্যা খুব কমিয়ে দেওয়া। যার ফলে লক্ষণকোষ গন্ধমাদনের ভিতর থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে পাওয়া হল সহজসাধ্য।

বাছাইকারী-লক্ষণ বুঝবার জন্য আমাদের একটি রোগী-বিবরণীর সহায়তা নেওয়া দরকার। ধরা যাক, রোগীটি পেটের অসুখে ভুগছে অনেকদিন। অজীর্ণ বাহ্যে ও টক বমি তার দুটি লক্ষণ। রোগী তার বিবরণে আরও নানা রকম লক্ষণ বললে। সে সবগুলিকে আমি ও আমার লক্ষণ-বাছাই রীতিতে, ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণাবলীর মধ্যে পার্থক্য বের করে নিতে হবে এর পর।

রোগী বলবে যে, ঠাণ্ডা জলকে ভয় করে সে বাঘের মত, ঠাণ্ডাতে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, শীতকালেই তার যত লক্ষণের বৃদ্ধি, শীতের রাত্রে আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়াটাই অভ্যাস ; চিকিৎসকের প্রশ্নে সে এক কথায় বলবে, আসলে আমি হচ্ছি শীতকাতুরে। ঐ লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে শীতকাতরতা। এটি একটি বাছাইকারী-লক্ষণ। আমাদের ঔষধের তালিকাতেও পাওয়া যাবে এমন কতকগুলি ঔষধ, যারা শীতকাতর। এখানে ডাঃ মিলারের শীত ও গ্রীষ্মকাতর ঔষধ তালিকাটির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। আমরা একটু পরেই তালিকাটি উদ্ধৃত করছি।

আমাদের পূর্বোক্ত রোগীটির জন্য ফস, নাক্স, লাইকো, সিপিয়া, আর্স এবং এমনিতরো আরও কতকগুলি ঔষধের মধ্যে

যে কোন একটি হয়তো লাগতে পারে; কিন্তু রোগীটির বাছাইকারী-লক্ষণে পাওয়া গেল শীতকাতরতা। যেহেতু বাছাইকারী লক্ষণে শীতকাতরতাটি আছে বলেই, যে-ঔষধগুলি গরমকাতর তাদের বাদ দিলেন অনায়াসেই। আপনার হাতে পুঁজি রইলো ফস, নাক্স, সিপিয়া প্রভৃতি শীতকাতর প্রধান ঔষধগুলি। ফলে, আপনার পরিশ্রম বাঁচলো অনেকখানি, কাজ এগোলো তার চেয়ে বেশি, রোগীর যন্ত্রণাভোগের সময়ও কমালেন সেই সঙ্গে। কথা উঠতে পারে যদি এমনিতরো বাছাইকারীভাবে শীতকাতর ও গরমকাতর লক্ষণের উপর নির্ভর করে ঔষধের নামাবলী ছাঁটা যায়, তার ফলে হয়তো আসল ঔষধটিও বেরিয়ে যেতে পারে। না; রোগী যদি সত্যিই শীতকাতর বা গরমকাতর হয় নির্ভরযোগ্য ভাবে, তা হলে সে ভুল হবে না কখনও। এমন কি রোগীটি যদি হয় বিশেষভাবে শীতকাতর, আর তার পেটের পীড়ার সব লক্ষণগুলোই লাইকোর সঙ্গে হুবহু যায় মিলে, তবুও লাইকো তার স্থায়িভাবে পেটের পীড়া দূর করতে পারবে না; হয়তো সাময়িক আরাম দেবে। কিন্তু আবার তার কষ্ট ফিরে আসবে, এমন কি পূর্বের চেয়ে বেশি হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ, লাইকো গরমকাতর, অথচ রোগীটি হল বিপরীতধর্মী,—শীতকাতর। এখানে অন্য সমলক্ষণের সাহায্যে শীতকাতর ঔষধের বাছাই প্রয়োজন।

আর এক রকমের রোগী আছে, যারা হল বিশেষভাবে গরমকাতর। এ ক্ষেত্রেও লক্ষণকোষ ঘাঁটবার পূর্বেই ডাঃ মিলারের বাছাইকারী লক্ষণ দেখে, শীতকাতর ঔষধগুলি বাদ

দিতে হবে। কি কি গরমকাতর ঔষধে বাকি লক্ষণগুলি মিলছে, তাই দেখতে হবে লক্ষণকোষ ঘেঁটে। শীতকাতর রোগীদের বেলায় যেমন শীতকাতর ঔষধগুলিই লক্ষণকোষ থেকে লক্ষণানুযায়ী বেছে তুলতে হবে, তেমনি গরমকাতর রোগীর বেলাতেও বাছতে হবে কেবলমাত্র গরমকাতর ঔষধগুলিই।

এরপর এমন একটা লক্ষণ বাছতে হবে, যার গুরুত্ব খুবই বেশি, তা সেটা মানসিক হোক বা অন্য কোন লক্ষণই হোক। কিন্তু লক্ষণটি যেন হয় রীতিমত মূল্যবান। এখন এটি হবে আমাদের নির্ধারিত রোগীর দ্বিতীয় বাছাইকারী লক্ষণ। লক্ষণ-কোষ থেকে এ লক্ষণটির ঔষধগুলি বাছতে হবে—শীতকাতর ও গরমকাতর রোগী হিসাবে। ফলে আমাদের ক্ষেত্র হবে আরও সঙ্কীর্ণ, ঔষধ হবে আরও সুপ্রাপ্য। এরপর, যে সব মূল্যবান ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণগুলির ঔষধ বাছতে হবে, কেবলমাত্র আমাদের পূর্বের বাছাইকারী লক্ষণে যে ঔষধগুলি ধরা পড়েছে, তাদের ভিতর থেকেই অবশ্য লক্ষণকোষের সহায়তা নিয়ে হয়তো এখানেই আমাদের প্রয়োজনীয় ঔষধটি মিলে যেতে পারে,—তখন সাধারণ লক্ষণগুলির জন্য লক্ষণকোষ ঘাঁটা হবে অনাবশ্যক এবং সময়নিষ্ঠতার অপরিচায়ক। কারণ, সাধারণ লক্ষণগুলির বিশেষত্ব নেই, প্রয়োজনও নেই এক্ষেত্রে।

আমরা দেখতে পাই, সাধারণত প্রত্যেকটি লক্ষণের জন্যই লক্ষণকোষ ঘাঁটার বাতিক আছে অনেকের। লক্ষণকোষ বস্তুটি বৃহৎ, তাকে অমনিতরো ভাবে বাগানোর চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব। মোটের উপর, বুদ্ধি দিয়ে রোগলক্ষণের মূল্য নিরূপণের

পর তাদের ঔষধ বাছাই ও যাচাই করা দরকার লক্ষণকোষ দিয়ে। সাধারণ-লক্ষণের পিছনে প্রায় ১০০।১৫০টি ঔষধের নাম পাওয়া যাবে—তার মধ্যে থেকে বিশল্যকরণী বাছাই করা তো দূরের কথা, বরং ধাঁধায় পড়া স্বাভাবিক। এখানে আমাদের পূর্বোক্ত প্রণালী নির্দিষ্ট কয়েকটি ঔষধে পৌঁছবার পর, তাদের সঙ্গে আমাদের রোগীটির সাধারণ-লক্ষণগুলি কোন্ কোন্ ঔষধে কেমনতরো মিলছে, তাই দেখা প্রয়োজন। এর দ্বারা আমাদের কাজ প্রায় সমাপ্ত হবে।

এক্ষণে কেণ্টের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়; তিনি বলেছেন, "এমন কোনও ঔষধের আশা কোরো না যার মধ্যে সার্বাঙ্গিক লক্ষণগুলি পাওয়া গেলে, যাবতীয় তুচ্ছ লক্ষণগুলিও অবশ্যই পেতে হবে। যদি ঔষধটির মধ্যে সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলীর সমাবেশ হয়, তবে যাবতীয় তুচ্ছ লক্ষণগুলির অনুসন্ধান করতে যাওয়া কেবল সময় নষ্ট করা মাত্র। যে সব ডাক্তার লম্বা লম্বা চিঠিতে নিরর্থক আঙ্গিক লক্ষণের পরিচয় দিয়ে সময় নষ্ট করে, তাদের সেই সব পত্র আমাকে যেরূপ অস্বস্তি দেয় তেমনি আর কোনও কিছুতেই অস্বস্তিভোগ করি না। সাধারণ আঙ্গিক (common particulars) লক্ষণগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যহীন।"

"সব চেয়ে **তীব্র, বিস্ময়কর অদ্ভুত লক্ষণগুলিই খুঁজে বার করতে হবে** এবং তারপর দেখ যে, রোগিবিবরণীতে এমন কোনও সার্বাঙ্গিক লক্ষণ নেই, যা কিনা উহার বাধাস্বরূপ বা বিরোধী হতে পারে"।

ডাঃ কেণ্ট পুনরায় বলেছেন, "যখন তুমি তোমার লক্ষণ-তালিকাটি দেখছ, তখন সর্বপ্রথম তিনটি, চারটি, পাঁচটি বা ছটি (অথবা যতগুলি পাওয়া সম্ভব) বিস্ময়কর, দুষ্প্রাপ্য ও অদ্ভুত লক্ষণগুলিকে খুঁজে বার কর—এইগুলি নিয়েই প্রথমে ঔষধ বাছাই সুরু করতে হবে। এইগুলিই সর্বোচ্চ সার্বাঙ্গিক লক্ষণাবলী কারণ, বিস্ময়কর, দুষ্প্রাপ্য এবং অদ্ভুত লক্ষণগুলি রোগীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যখন তুমি তিনটি, চারটি বা ছটি—ঔষধের মধ্যে এই প্রাথমিক পর্যায়ের সার্বাঙ্গিক লক্ষণগুলি দেখতে পাবে, তখন তোমায় লক্ষ্য করতে হবে যে, এই ঔষধ-তালিকার কোন্‌টির সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণাবলীর—সাধারণ ও আঙ্গিক শ্রেণীর—বর্তমান ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য দেখাচ্ছে"।

আর দু-একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। লক্ষণকোষের মধ্যে কতকগুলি ঔষধ লেখা থাকে মোটা হরফে আর কতকগুলির পাশে থাকে তারকাচিহ্ন (*)। সকলেই জানেন মোটা হরফের ঔষধগুলি যে লক্ষণের পাশে থাকে, সেই লক্ষণটি হচ্ছে ঐ-ঐ ঔষধগুলির মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান। এখানে ধরা যাক তাদের মূল্যমান ৩। তারকা-চিহ্নিত ঔষধের মূল্য মোটা হরফের চেয়ে কম। এখানে এদের মূল্যমান ধরা হল ২। আর বাকিগুলি যারা না আছে মোটা হরফে, না তারকা-চিহ্নিত, তারা সব চেয়ে ওঁছা, সবার নীচে তাদের মূল্য দেওয়া হয়েছে। ১ হচ্ছে তাদের মূল্যমান। লক্ষণকোষের মূল্যমান নির্ধারিত ঔষধগুলি জানা না থাকলে, রোগিক্ষত্রে

সঠিক সদৃশতম (similimum) ঔষধটি বাছাই করা হবে অসম্ভব।

এবার আমাদের কাজ হবে, খাতার পাতায় মানসিক, ব্যাপক, স্থানীয় এমনিতরো ভাবে প্রত্যেকটি লক্ষণকে একের পর এক সাজানো। প্রত্যেকটি লক্ষণের পরেই তাদের ঔষধের নামাবলী লেখবার জন্য ফাঁকা স্থান রাখতে হয় অনেকখানি, নইলে, লক্ষণকোষ ঘেঁটে ঔষধের নামাবলী লেখবার ঠাঁই-এর ঘটবে অকুলান। যাদের পাশে তারকা-চিহ্ন থাকবে, লেখবার বেলাতেও সেটা দিতে হবে, আর বড় হরফের ঔষধের বেলায় এখানে সেটা বুঝাতে হবে পাদরেখা (underline) টেনে দিয়ে।

যখন উপরি-উক্তভাবে লক্ষণের পাশে ঔষধের তালিকা জোড়া শেষ হল, তখন আমাদের কাজ হবে অঙ্ক কষে তাদের মূল্যমান বের করা। এক-একটি বিভিন্ন ঔষধ কটি লক্ষণের গায়ে আছে, তা গণনা করে লিখতে হবে, আর তাদের মূল্য মানের অঙ্কটাও লেখা থাকবে সেই সঙ্গে। এমনি করে প্রত্যেকটি ঔষধের মূল্যমান এবং কটি লক্ষণে তারা সাড়া দিয়েছে লিখতে হবে। পরের কাজটি হল তুলনামূলকভাবে বিচার করা;—কোন্ ঔষধটি কতগুলি লক্ষণের মধ্যে বর্তমান এবং তাদের মূল্যমানের সমষ্টিটাই বা কত। যার অঙ্ক-সংখ্যা বেশি অর্থাৎ যে ঔষধের মূল্যমানের সমষ্টি হবে সর্বাধিক, সেইটিই হবে এক্ষেত্রে সদৃশতম-ঔষধ (similimum)। আর বাকিগুলো তার কাছ দিয়ে যাচ্ছে বলে, তারা হয়তো "আঁকাবাঁকা ভাবে"

রোগী আরোগ্যের সহায়তা করতে পারে : সেই হেতু তাদের দু-একটিকে সদৃশ-ঔষধ (similar) বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন নেই, যেহেতু সদৃশতম-ঔষধটিই হচ্ছে আসল কর্তা।

আমাদের ঔষধ-বাছাই-এর কাজটি এমনি সহজ অথচ নির্ভুলভাবে শেষ হলে রোগী আরোগ্যের পথে বিশেষ বাধা রইবে না কোনো। আমরা যদি ধনাগারের ঠিক চাবি-কাঠিটি হাতে পাই, তবেই ধনাগারের ধন-সম্পদ হবে আমাদের ব্যবহার্য। নইলে, ঘরটি তোমার চাবি-কাঠিটি আমার বলে,যদি কেউ ধনাগারের সম্পদভাগের ভারটা দেয় আমাদের উপর, তাতে নিষ্ফল আক্রোশে হাত কামড়ানো ছাড়া আর উপায় কি ? তাই লক্ষণকোষ থেকে ঔষধ-বাছাই-প্রণালীটি যদি জানা থাকে, তবেই তার ভিতরের বস্তুটিকে কাজে লাগানো যাবে ঠিকমত। কারণ, এই প্রণালীটিই যে, লক্ষণকোষের ধন-ব্যবহারের একমাত্র চাবিকাঠি, এ বিষয়ে নেই কোন সন্দেহের অবকাশ।

ডাঃ গিবসন মিলারের শীতকাতর ও গ্রীষ্মকাতর প্রধান ঔষধসমূহ ঃ

শীতকাতর প্রধান ঔষধাবলী—*আর্স-অ্যা, *অরাম, অরাম আর্স, অরাম সালফ, *আর্জেন্ট-মেট, আর্সে, আর্স-সা-ফ্রেভা, *অ্যাগারি, *অ্যাপোসাই, অ্যাব্রোট, *অ্যামন-কা, *অ্যালু-ফ, *অ্যালুমি, *অ্যালুমেন, *অ্যালুমি-সিল, *অ্যাসেটিক-অ্যাসিড,

অ্যাসারাম, *ইউফ্রে, *ইগ্নেসিয়া, *অ্যাকোন-ন্যা, *ককুলাস, *কফিয়া, *কলচি, *কলোসিন্থ, **কস্টিকাম**, *কার্বো-ভে, *কার্বো-সা, *কার্বো-অ্যা, কার্ড-মে, **কেলি আর্স**, **কেলি-কা**, *কেলি ক্লোর, কেলি ফস, *কেলি বাই, *কেলিসিলি, *কোনি, **ক্যাপসি**, *ক্যামোমি, ক্যাম্ফর, *ক্যান্থারিস, *ক্যাডমি, *ক্যাল্কে-আর্স, **ক্যাল্কে-কা**, **ক্যাল্কে-ফস**, *ক্যাল্কে-ফ্লুওর, *ক্যাল্কে-সিলি, *ক্যালিয়া, *ক্রিয়োজোট, **গ্র্যাফা**, গুয়েকা, **চায়না**, *চিনি-আর্স, *চেলিডো, *জিঙ্কাম, **ডালকামারা**, *থেরিডি, **নাক্স ভম**, *নাক্স-ম, **নাইট্রিক-অ্যাসি**, *নেট্রাম-আ, *নেট্রাম-কা, *পেট্রো, **ফস**, *ফস-অ্যা, *ফর্ম, **ফেরাম মেট**, *ফেরাম-আ, বেঞ্জয়িক-অ্যা, *বেলে, *বোরাক্স, *ব্রোম, *ব্যাডিয়া, **ব্যারাই-কা**, *ব্যারাই-মি, ভ্যালেরি, *ভায়োলা-ট্রা, *মিউরি-অ্যা, **ম্যাগ-কা**, **ম্যাগ-ফ**, *ম্যাঙ্গা, **মস্কাস**, **রাস**, রুটা, রিউমেক্স, *সাইক্লে, **সাইলি**, *সালফ-অ্যাসি, *সার্সা, **সিপিয়া**, *সিমিসি, *সিস্টাস, **স্যাবাডি**, *স্ট্যানাম, স্ট্যাফিসে, **স্ট্রনসিয়াম**, স্ট্র্যামোনিয়া, **স্পাইজি**, *হাইওসি, **হাইপেরি**, **হিপার**, *হেলিবো, *হেলোনি।

<u>গ্রীষ্মকাতর প্রধান ঔষধাবলী</u>—*অরাম আই, *অরাম-মি, আস্টিলেগো, **আইও**, **আর্জেণ্টাম নাই**, *ইস্কুলাস, **এপিস**, অ্যাম্ব্রা, *অ্যালি-সে, *অ্যালো, *অ্যাসাফিটি, *ওপি, কক্কাস-ক্যা, **কেলি আই**, **কেলি-সা**, *ক্যাল্কে-আ, *ক্যাল্কে-সা, *ক্যালেডি, ক্রোকাস, *গ্র্যাটি, টিউবার (রোবি), *ড্রসেরা,

থুজা, নিকো, **নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সা, পালস,** পিক্রিক-অ্যা, প্ল্যাটি, ফেরাম-অ্যা, **ফ্লুওরিক-অ্যা,** *ব্রাইও, ব্যারাইটা অ্যা, *ল্যাকে, *লিডাম, লিলি, *লাইকো, *সালফ, *সালফ-আই, **সিকেল, স্যাবাইনা,** *স্পঞ্জি, *হ্যামা।

শীত ও গ্রীষ্ম উভয় আবহাওয়াতেই কাতর ঔষধাবলী—**মার্ক,** *ইপি, নেট্রাম-কা, সিনেবার।

অ্যান্টিম-ক্রুড ঃ—গরম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি; প্রচণ্ড গরমে ও বিকীর্ণ-তাপে বৃদ্ধি হলেও, অনেক অবস্থায় তাপে হ্রাসও হয়।

চিররোগে, মার্কুরিয়াস ঠাণ্ডায় বাড়ে, কিন্তু অচিররোগে গরমে বাড়ে।

একটি রোগিবিবরণীর সাহায্যে ঔষধ বাছাই-করণের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

শ্রীমতী·····। বয়স ৪৬। মাথা ঘুরে বাঁ দিকে পড়ে যায়। চোখ বন্ধ করলে ভালো থাকে, ঠাণ্ডা হাওয়াতে আরাম। মাথার বাঁ-দিকে বেদনা,—ঠাণ্ডা জল-প্রয়োগে বেদনা হ্রাস। ক্ষুধা কম। গায়ের চামড়া খস্‌খসে্। ঋতুস্রাব (মাসিক) প্রায় ১ বৎসর বন্ধ আছে (climacteric stage)। মিষ্ট দ্রব্য, গরম খাবার খেতে ইচ্ছা করে।

টক খেতে অনিচ্ছা।

লম্বা, পাতলা চেহারা।

রোগিনীটি গরমকাতর।

ব্যাপক লক্ষণাবলী—

অত্যন্ত গরমকাতর।

ক্রন্দনশীলা।

কুপিত স্বভাব—প্রাতঃকালে।

স্বপ্নাবিষ্ট নিদ্রা।

প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

বাঁ-দিকে রোগের ব্যাপকতা।

ঠাণ্ডায় আরাম।

পূর্ব-চিকিৎসার বিবরণ ঃ—এক কথায়, অ্যালোপ্যাথির চরম-চিকিৎসা হয়েছে।

বংশ-রোগের ইতিহাস ঃ—মাতৃকুলে জনৈক নিকট আত্মীয়ের কুষ্ঠরোগ ছিল। ধরা যেতে পারে রোগিনী প্রবলভাবে সোরাদোষে দুষ্ট। বাল্যে এবং পরে আরও ২।১ বার ভয়ানকরূপে খোস-পাঁচড়া হয়েছিল। এখানে গরম-কাতরতাটি হচ্ছে 'বাছাইকারী'-লক্ষণ; অতএব কেবলমাত্র গ্রীষ্মকাতর-প্রধান ঔষধগুলিই নিম্নোক্ত তালিকাটিতে দেওয়া হল ঃ—

ক্রন্দনশীল—(কেন্টের লক্ষণকোষ, পৃঃ ১০২)—*আইও, *আর্জেন্ট-নাই, **এপিস**, *ক্যাক্টাস, ক্রোকাস, কেলি আই, **নেট্রাম-মি**, *নেট্রাম-সা, ড্রসেরা, **পালস, প্ল্যাটি, লাইকো,** *লিলি, ল্যাকে, লিডাম, **সালফ**, স্যাবাইনা, স্পঞ্জিয়া।

কুপিত স্বভাব,—প্রাতঃকালে ঃ—(পৃঃ ৬৮)—*নেট্রাম-মি, *নেট্রাম-সা, থুজা, নিকো, প্ল্যাটি, *ল্যাকে. সালফ।

স্বপ্নাবিষ্ট-নিদ্রা ঃ—(পৃঃ ১২৪৮) অ্যাম্ব্রা, কক্কাস, নেট্রাম-মি, ফেরাম-আ, লাইকো, সালফ, *স্পঞ্জিয়া।

ইচ্ছা, নিষ্টদ্রব্যে ঃ—(পৃঃ ৪৯৭)—আর্জেণ্ট-নাই, ওপি, নেট্রাম-মি, *ব্রাইও, লাইকো, সালফ, *সিকেল।

† ইচ্ছা, গরম খাদ্যে/পানীয়ে ঃ—(পৃঃ ৪৯৭)—কক্কাস, *ক্যালেডি, *ফেরাম, ব্রাইও, *লাইকো, *সালফ।

অনিচ্ছা, অম্লে ঃ—(পৃঃ ৪৯১)—*সালফ।

মাথা-ঘোরা, বাঁ-দিকে পড়ে যায় (পৃঃ ১০৯)-*ল্যাকে, নেট্রাম-মি, *সালফ।

মাথা-ঘোরা, চোখ বন্ধ করলে—(পৃঃ ১০৮)—*এপিস, আর্জেণ্ট-নাই, ক্যালেডি, গ্র্যাটি, ল্যাকে, *থুজা।

মাথা-বেদনা, ঠাণ্ডা-জলে হ্রাস (পৃঃ ১৬১)—অরাম-মি, আইও, অ্যালো, *ব্রাইও, নেট্রাম-সা।

মাথাবেদনা, অপরাহ্ণকালে, বাঁ-দিকে (পৃঃ ১৬৫)—আর্জেণ্ট-নাই, *অ্যালো, ক্যাল্কে-সা, নেট্রাম-মি, লিলিয়াম, ব্রাইও, লাইকো, সালফ।

এক একটি ঔষধ কয়টি লক্ষণে এসেছে এবং তাদের প্রত্যেকটির মূল্যমান কি, তা কষে বার করবার পর আমরা দেখতে পেলাম ঃ—

সালফার ঔষধটি ৮টি লক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে এবং মোট মূল্যমান হচ্ছে ১৫। সালফ=$৮^{১৫}$, নেট্রাম-মি=$৬^{১১}$;

† উপরি উক্ত দুটি লক্ষণ এক সঙ্গে ধরে বাছাই করা হয়েছে।

লাইকো = $৫^{১০}$; ব্রাইও = $৪^{৮}$; ল্যাকে = $৪^{৮}$; আর্জেণ্ট-নাই = $৪^{৮}$ ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে রোগিনীর ঔষধটি হবে, **সালফ** অথবা **নেট্রাম-মি**, কারণ, ওদেরই মূল্যমান হচ্ছে সর্বোচ্চ। এখানে একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন ; আমরা যেন সর্বক্ষেত্রেই একটা বাঁধা-ধরা রুটিনকে প্রশ্রয় না দিই, বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করি। এক্ষেত্রেও তাই।

আমরা রোগিনীর **বয়স, রোগাক্রান্ত পার্শ্ব** এবং **প্রাতে বৃদ্ধি**—এই তিনটি অবস্থা বিবেচনা করে **ল্যাকে** ২০০ এক মাত্রা প্রয়োগ করি ; ফলে, ৩।৪ দিনের মধ্যেই রোগিনী বোধ করেন অনেকখানি উপশম, যা তিনি দীর্ঘ ২।৩ বৎসরের মধ্যে উপভোগ করেন নি। দিন পঁচিশেক পরে রোগিনীর উন্নতিতে একটা স্থিতিভাব আসে ; তখন শক্তিপরিবর্তন-রীতিতে ল্যাকে আর এক মাত্রা দেওয়া হয়। এর পর প্রায় ১-১॥ মাস ধরে রোগিনীর অবস্থার উন্নতি চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। পরে অবস্থার একটু অবনতি ঘটায়, একমাত্রা ১০০০ শক্তি দেওয়ার ফলে রোগিনী প্রায় দু বৎসরের অধিককাল হল বেশ ভালো আছেন।

একটা কথা বলা দরকার এখানে। নইলে অনেকের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকা বিচিত্র নয়। সালফারের মূল্যমান যেখানে সর্বোচ্চ, সেখানে রোগীক্ষেত্রে সালফার প্রয়োগ উপেক্ষিত হল, কী কারণে ? এর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে দুটি—একটি রোগিনীর বংশগত প্রচণ্ড সোরাদোষ ; যদিও তা এক্ষেত্রে সুপ্ত।

সালফ উচ্চশক্তি-প্রয়োগে সুপ্তসোরা (এখানে আদিম সোরা-বিষের বহিঃপ্রকাশ যে কুষ্ঠ রোগ) জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা, রোগিনীর বয়স এবং কুষ্ঠ রোগটির প্রচণ্ডতা স্মরণ করে আমি এক্ষেত্রে এমনিতরো পরীক্ষাকার্যে সাহসী হই নি। দ্বিতীয়ত ল্যাকেসিসও একটি গভীর ক্রিয়াশীল সোরাঘাতী-ঔষধ, কিন্তু সালফারের তুল্য নয়। অতএব এর উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করাও অন্যায় হয়নি কিছুমাত্র।

উপরি উক্ত রোগিতত্ত্বটির সাহায্যে ব্যাপক-লক্ষণসমূহ যে কিরূপ মূল্যবান, কেবলমাত্র তাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যথাসাধ্যভাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

চক্রাবর্ত-প্রণালী ঃ (১)

সাইকোসিস

নির্ভুল ও নিঃসংশয়ভাবে ঔষধ বাছতে হলে, পূর্ববর্ণিত গাণিতিক পদ্ধতিটি অনুসারে লক্ষণকোষের সাহায্য নেওয়া যে সর্বাংশে শ্রেয়, একথা অনস্বীকার্য। আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'লক্ষণকোষে'র যে রীতিমত মূল্য আছে, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ রইবে না কারো মনে। কিন্তু পূর্বে, হ্যানিম্যানের আমলে 'লক্ষণকোষে'র অবস্থা ছিল এমনি অসম্পূর্ণ যে, তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা চলতো না কোন মতেই। তাই, হ্যানিম্যান ছিলেন তৎকালীন লক্ষণ-কোষের সহায়তা নেওয়ার বিরোধী। বর্তমানে ডাঃ কেন্টের লক্ষণকোষপুস্তকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যান্য বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থরাজির মধ্যে এটিও একখানি অমূল্য সম্পদ। ঠিকমত ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে এর মূল্যবোধ, নইলে বিরাট পুস্তকখানি কেবলমাত্র পাঠাগারের একটি কোণ ভরিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনও কাজেই আসবে না। কেমন করে লক্ষণ-কোষের সাহায্যে ঔষধ-বাছাই করা সহজ হবে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যে-ক্ষেত্রে রোগীটি হচ্ছে চিররোগগ্রস্ত, সেখানেই এমনিতরো ভাবে ঔষধ-বাছাই-এর বিশেষ সুবিধা। কারণ, লক্ষণকোষের সহায়তা নিতে হলে, হাতে সময় থাকা চাই

যথেষ্ট, নইলে, ব্যস্ততার ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা। স্বল্পস্থায়ী রোগের বেলায় পূর্বোক্তপদ্ধতিটি যে সুবিধাজনক নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, রোগী যেখানে জীবন্মৃত্যুর সীমানায় লড়াই করছে, সেখানে যথেষ্ট সময়ের সুযোগ নিতে যাওয়া শুধু মূর্খামিই নয়, অধিকন্তু মেটিরিয়া মেডিকায় জ্ঞান না থাকার নিদর্শন। স্থায়িত্বের এবং দায়িত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অচিররোগ যেমন মারাত্মক হয়ে ওঠে অত্যল্প সময়ের মধ্যে, তেমনি যদি তার ঔষধ বাছাই করা না হয় যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা ও নিঃসংশয়তার সঙ্গে, তা হলে রোগীকে হারাতেও হয় অনেক সময়। এসব রোগিক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচনের উপায় কী, তার আলোচনা করবো পরে।

পূর্বোক্ত প্রণালীতে ঔষধটি বাছাই হলেও, (কেবলমাত্র অচিররোগের ক্ষেত্র ছাড়া) চিররোগের বেলাতে আরও দু-একটি সদৃশ-ঔষধের প্রয়োজন হয় প্রায়ই। তার কারণ আছে অনেকগুলি। প্রথম ও বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে, রোগীর জীবনী-শক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ত্রিদোষের (miasma) যে কোন একটির অথবা একাধিক দোষের একত্র সমাবেশ। তাদের ক্রিয়াফলে বিভিন্নতার জন্য নামও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রকমের। সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসই হচ্ছে—এই ত্রিদোষ। এদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে। তবে মোটামুটিভাবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, চিররোগীদের দেহে, এদের বহিঃপ্রকাশ থাকবেই বিশেষভাবে। তা না হলে তাদের আসল রূপটি ধরা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, রোগীর সুদীর্ঘ ভোগকালের ফলে পরিবর্তিত মানসিক ও দৈহিক অবস্থা। এই ভোগকালটি অসাধারণভাবে দীর্ঘ হতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগীর ভোগকাল তার সুদীর্ঘ রুগ্ন জীবনকেও ছাড়িয়ে যায়। কথাটা শুনতে হেঁয়ালীর মত হলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাই। সোরাদোষের স্থায়িত্বের কথা ধরতে গেলে, আমাদের জীবনে তার প্রভাব প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। কখনও সুপ্ত থাকে সে, কখনও বা নাড়া পেয়ে জেগে ওঠে। সুপ্ত সোরার কথা ছেড়ে দিলেও, বিকশিত সোরাও দেহ হতে দেহান্তরে অনুপ্রবেশ করছে বংশানুক্রমিকভাবে। সিফিলিস ও সাইকোসিস দোষ দুটিও তিন চার পুরুষ ধরে, নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে রক্ষা করে চলেছে তাদের ধারাবাহিকতা।

তৃতীয় কারণ হিসাবে রোগীর অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা-প্রণালী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই হচ্ছে কতকটা দায়ী। চিররোগীদের চিকিৎসায় তাদের জীবনযাত্রার ধারাকে সংযত করতে হবে কতকগুলি বাধানিষেধের বাঁধ বেঁধে। অসংযমের বন্যাকে রোধ না করলে রোগারোগ্যের চেষ্টা হবে নিষ্ফল ও অর্থহীন।

পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রাখাই হচ্ছে জীবনের ধর্ম। সে ধারাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার সহায়তা করে আমাদের জৈব-গতি। গতিই হচ্ছে মুখ্যত জীবনের লক্ষণ। যখন কোন একটা অদৃশ্য বিরুদ্ধ শক্তি সে গতিকে ভিন্ন পথে চালিয়ে দেয়,

তখনই সুরু হয় নানারকমের বিকৃত লক্ষণরাজির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সে লক্ষণরাজিও পরিবর্তন হয়ে চলে ক্রমাগত। কারণ, এখানেও রয়েছে সেই গতিবেগ। যখন সেই বিপথগামী গতিকে নিজের পথে ফিরিয়ে আনতে ঔষধের প্রয়োজন মনে করি, তখনও লক্ষ্য রাখতে হয় যে লক্ষণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের পরিবর্তন হচ্ছে কি না। যদি তা না হয়, তবে হোমিওপ্যাথির প্রথম সূত্র—"সমঃ সমং শময়তি"—অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না বুঝতে হবে। ফলে আরোগ্যও হয় না। এমন কী, যদি একটি সদৃশ ঔষধই বরাবর দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সেখানেও তার শক্তির পরিবর্তন করতে হবে ক্রমাগত। কারণ, পরিবর্তন না করলে, ঔষধের গতি (ক্রিয়া) হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের এই গতিটিই হচ্ছে বিশেষ লক্ষণীয় এবং চিররোগে একাধিক ঔষধ দেওয়ার উল্লেখযোগ্য চতুর্থ কারণ।

যাই হোক, এটা বেশ বোঝা গেল, জটিল পীড়াতে একাধিক ঔষধের প্রয়োজন হয় কি কি কারণে। এখন আসল বক্তব্যটা হলো, ঐ সব রোগীদের বেলায় ঔষধ বাছাই করার পদ্ধতিটা হবে কী প্রকার। তারই আলোচনা করব এর পর।

পূর্বেই বলেছি, সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস দোষত্রয়ের এক বা একাধিকের সংক্রমণের ফলেই জীবনীশক্তির মধ্যে প্রথমত এবং পরে দেহের মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষণের বিকাশ হয়। এদের মধ্যে সোরাই সব চেয়ে প্রবল এবং অন্যান্য দোষত্রুটির মধ্যে প্রধান। পৃথিবীতে বোধহয়, এমন ব্যক্তি

প্রায় বিরল, যিনি সম্পূর্ণভাবে সোরামুক্ত। সমস্ত মানব-গোষ্ঠির মধ্যে আজ সুপ্ত সোরা বর্তমান। কেবল বিকশিত সোরার ক্ষেত্রেই তারতম্য দেখা যায়। যার দেহে বিকশিত সোরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায়, তার চিকিৎসা যেমন সহজসাধ্য, তেমন সহজভাবে আরোগ্য করা সম্ভব হয় না, যে চিররোগী দেহে সোরার গৌণলক্ষণগুলি বিকশিত হয়েছে পূর্ণভাবে। আবার যে ক্ষেত্রে সোরার সঙ্গে সিফিলিস বা সাইকোসিস মিলিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও রোগীটি রীতিমত দুশ্চিকিৎস্য।

রোগী চিকিৎসার সময় দেখতে হবে রোগীটি প্রধানত কোন্ দোষে দুষ্ট বা তার মধ্যে কোন্ দোষের প্রাধান্য। তা না জানলে চিকিৎসাসঙ্কট হওয়ার সম্ভাবনা। চিররোগের বেলায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বাছাই করতে হলে, রোগীর জৈব-শক্তির পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন হয়, তা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি এর মূলে কোন বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া বর্তমান, তাও নির্ধারণ করতে হবে সেই সঙ্গে। এবার আমরা সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষের বহিঃপ্রকাশ জানবার আভাসটুকু দেবো, পরে আলোচনা করবো তাদের চিকিৎসাধারা। হ্যানিম্যান যে তিনটি miasma বা দোষের কথা বলেছেন, তার মধ্যে সাইকোসিসের ক্ষমতা এবং বিস্তৃতিই বোধ হয় ন্যূনতম।

সাইকোসিস-দুষ্ট রোগীর চিকিৎসার প্রথম কথা হচ্ছে, রোগীটি প্রকৃতই সাইকোসিসের কিনা, তার পরিচয় নেওয়া।

সে পরিচয় পেতে হলে জানতে হবে তার বংশগত ও ব্যক্তিগত ইতিহাস। ব্যক্তিগত ইতিহাসের পাতা উল্টালে বহুক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়, সাইকোসিস দোষটি তার স্বোপার্জিত। নিজের পাপের ফলেই সে এমনিভাবে একটা বিষের ক্রিয়ায় হয় জর্জরিত, নিজের দেহকে করে তোলে পীড়িত এবং অনাগতদের জন্য রেখে যায় বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা।

সাইকোসিস-দোষ স্বোপার্জিত ছাড়া, পৈত্রিকও (বা বংশগত) হতে পারে; অর্থাৎ পৈত্রিক দোষটিও সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। যদি পিতা-মাতার উপযুক্ত চিকিৎসা না হয় কিংবা চাপা দেওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় তাঁদের জীবনে, তবেই সন্তানদের উপর দুগ্রহের মতো এর ভার চেপে বসে। পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্যে দোষগুলি যেন সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তখন সাইকোসিসকে বিনাশ করতে বেগ পেতে হয়। এ শুধু সাইকোসিসের ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য, তা নয়, যে কোন মায়াজমের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে।

ব্যক্তিগত রোগেতিহাসের সূত্রে যখন সাইকোসিসের পরিচয় পাওয়া গেল, তখন সংগ্রহ করতে হবে তার অতীত ও বর্তমান লক্ষণাবলী। এখানে লক্ষণসঞ্চয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সাইকোসিস-নির্দেশক লক্ষণ আছে কি কি। সাইকোসিস-নির্দেশক লক্ষণসমূহই হচ্ছে, আমাদের বর্তমান রোগীর হোমিওপ্যাথিক মতে একরকমের প্যাথলজি (pathology)। এই প্যাথলজির সন্ধান

করতে না পারলে, সাইকোসিস দোষটির ডায়াগনোসিস (diagnosis) সম্ভব নয়।

সাইকোসিস নির্দেশক লক্ষণাবলীর কী পরিচয়, এবার তাই লিপিবদ্ধ করবো ; তবেই রোগীক্ষেত্রে বুঝতে পারা যাবে যে, রোগীটি সাইকোসিস-দুষ্ট কী-না। অনেক প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথদের মতে সাইকোসিস নির্ধারক-লক্ষণ হচ্ছে প্রধানত এই কটি ঃ

১। দেহে আঁচিল ইত্যাদির বহিরাগমন ; বিশেষত রোগাক্রমণের প্রথমাবস্থায়।

২। বর্ষাকালে, স্যাঁতসেঁতে ঘরে এবং ভিজে আবহাওয়ায় রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

৩। রাত্রির চেয়ে দিনের বেলাতেই রোগীর কষ্টগুলি বাড়তে থাকে অনেকখানি।

৪। গনোরিয়া রোগটির লক্ষণাবলী, যথা—লিঙ্গ হতে পুঁজ বের হওয়া, প্রস্রাবের সময় জ্বালা ইত্যাদি।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি স্থানীয় লক্ষণ পাওয়া যায়, যাদের কথা বলা হয় নি এখানে। গনোরিয়া (gonorrhoea) রোগটিতে যে সমস্ত লক্ষণ মিলে,সেইগুলিকেই সাইকোসিসের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলেই ধরা হয় অনেক সময়। তার মানে এ নয় যে, সাইকোসিস মাত্রই গনোরিয়া ; তবে গনোরিয়া রোগটি সাইকোসিস-দোষের আকর বলেই জ্ঞাত। কিন্তু গনোরিয়া না হলেও রোগী সাইকোসিস-দোষদুষ্ট হতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি হবে আরও পরিস্ফুট। আমরা

জানি, বসন্ত-রোগের প্রতিষেধ করা হয় 'ভ্যাক্সিনেসন' (vaccination) দিয়ে ; কিন্তু তার ফলে দেহের মধ্যে দেখা গিয়েছে সাইকোসিসের প্রাদুর্ভাব। 'ভ্যাক্সিনেসন' মারফৎ কেমন করে এ দোষ সংক্রামিত হয়, সে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

রোগের নামানুসারে আমরা চিকিৎসা না করলেও, চিকিৎসা-জগতে রোগের নামকরণ চলতে থাকবেই ; এবং এর প্রয়োজনও আছে একদিক দিয়ে। কোন্ কোন্ রোগগুলিকে সাইকোসিসের বেড়াজালে ফেলতে পারা যায়, তারই নাম কটি দিয়ে, আমরা সুরু করবো সাইকোসিস-দোষটির ঔষধ-বাছাই-প্রণালী। এ নামগুলি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে সাইকোসিসদুষ্ট রোগের একটা ছাপ দেওয়া। সাইকোসিস দোষান্তর্গত রোগবিশেষের নাম হলো—গনোরিয়া, বাত, হাঁপানি, আঁচিল, অর্বুদ, জননেন্দ্রিয় ও মূত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি পীড়া, স্যালপিনজাইটিস, মেট্রাইটিস, সেলুলাইটিস ইত্যাদি।

পূর্বেই বলেছি, রোগীদেহে এক বা একাধিক দোষের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। সাইকোসিসের বেলাতেও তার ব্যত্যয় হয় না। হয় বিকশিত সোরা, নয় সিফিলিস-দোষের সংমিশ্রণ দেখা যায়। কদাচিৎ তিনটি দোষই একত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আবার সাইকোসিসের চিকিৎসা যদি বে-নিয়মে হয়, তবে তার গতি বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হওয়ার ফলে, রোগের অবস্থা দাঁড়ায় জটিলতর। সেখানে ঔষধ বাছাই করতেও বেগ পেতে হয় রীতিমত। একে ত মানুষের

জীবনযাত্রা বর্তমানে মোটেই স্বাভাবিক নয় এবং ক্রমশই তা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রায় দু-তিনটি দোষের মিশ্র অবস্থায় রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে কঠিন, তার উপরে, যদি কুচিকিৎসায় তার গতি পরিবর্তন করা হয়, তবে দুঃখের সঙ্গেই মেনে নিতে হবে মানুষের এই চরম দুর্গতিকে এবং পথও পাওয়া যায় না সেখানে।

সাইকোসিস-দোষটি যদি একেশ্বররূপে তার প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং যদি তাকে আদিমাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে চিকিৎসা করাও চলে সুষ্ঠুভাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এমন একটি সদৃশতম ঔষধ বাছতে হবে, যার নাম ডাক রয়েছে অ্যান্টিসাইকোটিক (antisycotic) মহলে। হ্যানিম্যানের আমলে থুজা ও নাইট্রিক অ্যাসিডের খ্যাতি ছিল অসামান্য; আজও তা একটু ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু আমাদের মেটিরিয়া মেডিকায়, আরও অনেকগুলি ঔষধ বর্তমানে পাওয়া যাবে, যারা অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের মর্যাদা বাড়াচ্ছে। তাই সাইকোসিসের বিরুদ্ধে আরও জোর লড়াই-এর সুবিধা হয়েছে।

কিন্তু যেখানে একাধিক দোষে রোগীর অবস্থা জটিল, সেখানে নিম্নোক্ত ধারায় ঔষধ বাছাই করতে হবে—

প্রথমত বিকশিত সোরাকে সুপ্তাবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, তারপরে প্রয়োজন হবে সাইকোসিস চিকিৎসার। শেষত সিফিলিসকে উৎখাত করা আবশ্যক। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অ্যান্টিসোরিকের; দ্বিতীয়টি বিনাশ করতে চায় অ্যান্টি-

সাইকোটিক ; এবং শেষোক্ত কার্য করবে যথানির্দিষ্ট অ্যান্টি-সিফিলিটিক বা উপদংশঘ্ন ঔষধ। এমনিতরো উপায়ে রোগ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ধারাটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

এখন জানা দরকার যে, কোন্ অবস্থা থেকে উক্ত পর্যায়ের ক্রমিক-চিকিৎসাটি আরম্ভ করতে হবে। একটা জ্যামিতিক-অঙ্কনের সাহায্য নেওয়া যাক। নিম্নে অঙ্কিত চিত্রটির সাহায্যে ত্রিদোষের বিরুদ্ধে চক্রাবর্ত-প্রণালীতে আক্রমণের সুরু হবে কেমনভাবে এবং কোথায় হবে তার শেষ, তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হল।

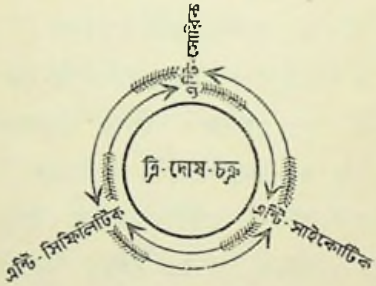

ত্রি-দোষচক্রটি হল ব্যক্তিবিশেষের ত্রিদোষের একত্র অবস্থানের প্রতীক, কোন একটি ব্যক্তির দেহে যখন একত্রে সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস বর্তমান, তখন তার চিকিৎসা করা হয় উক্ত চিত্র নির্দিষ্ট চক্রাবর্ত-প্রণালীতে। যখন যে দোষের প্রভাব অধিক লক্ষিত হয় রোগীর লক্ষণসমূহের মাধ্যমে, তখন প্রথমে সেই দোষঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করাই আমাদের

কর্তব্য। পরে আবার যখন উক্ত দোষের কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস ঘটে, তখন অন্য আর একটি 'দোষ' মাথা তুলে দাঁড়ায়—যাকে বিনাশ করবার ঔষধ হল, সেই দোষঘ্ন সদৃশ-ঔষধ। এই ভাবে একটির পরে একটি 'দোষে'র বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয় ততক্ষণ, যতক্ষণ না শরীর থেকে 'ত্রিদোষের' প্রভাব হয় অবলুপ্ত।

চিত্রটিতে বৃত্তকে বেড় দিয়ে পরস্পর বিপরীতমুখী 'তীর চিহ্নে' (⇄) রোগের প্রভাবানুযায়ী দোষঘ্ন-ঔষধ ব্যবহারের আভাস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, রোগীর লক্ষণাবলীতে যদি সোরাদোষের প্রভাব অধিক দেখা যায়, তবে সোরাবিনাশী বা অ্যান্টিসোরিক ঔষধের হবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ; তৎপরে যদি সিফিলিস বা সাইকোসিস-দোষের প্রাধান্য ঘটে, তবে আমাদের অ্যান্টিসিফিলিটিক বা অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ; চিত্রে সেই কথাটিই বলা হয়েছে। এমনিভাবে হয়তো আবার সাইকোসিস অথবা সিফিলিস দোষের অভ্যুত্থান ঘটতে পারে, যাদের দাবাবার জন্য দরকার অ্যান্টিসাইকোটিক বা অ্যান্টিসিফিলিটিকের। পুনরায় আবার সোরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় যদি, তবে আবার সোরা-দোষঘ্ন সদৃশ ঔষধের হবে প্রয়োজন। এমনিভাবে চক্রাবর্তহারে একটির পর একটি সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসদোষবিনাশী কয়েকটি ঔষধ পর্যায়ক্রমে দেওয়ার দরকার হতে পারে ; এবং চিররোগের ক্ষেত্রে প্রায়ই দরকার হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীদেহে ত্রিদোষের এক বা একাধিক লক্ষণের প্রাধান্য ঘটতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত

চক্রাবর্ত-প্রণালীতে দোষের পরমায়ু ক্ষয়িয়ে আনাই সুবিধা-জনক ও নির্মল আরোগ্যদায়ক।

আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। ঔষধের কাজ পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত, ভৈষজ্য-ক্রিয়ার ব্যাঘাত করা চলবে না। এই ক্রিয়াকালটি একঘন্টা, একদিন কিংবা এক বা একাধিক মাস ও বর্ষ ধরে চলতে পারে। রোগের পর্যায়ক্রমিক বাড়া-কমার ভিতর দিয়েই দোষগুলি হবে নির্মূল। চিকিৎসাকালে দু-একটি স্থানীয়-লক্ষণের বৃদ্ধি হতে পারে কখনও কখনও, কিন্তু ব্যাপকক্ষেত্রে রোগী আরাম পাবে নিশ্চয়ই। অবশ্য নিশ্চিত ঔষধ প্রয়োগের ফলেই ঐরূপ সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

চক্রাবর্ত-প্রণালী—(২)

সিফিলিস

মোটামুটিভাবে, এই তো গেল সাইকোসিসের কথা। এরপর সিফিলিস দোষটির বিষয়ে বলবো যৎসামান্য। সিফিলিস দোষটির চিকিৎসাতেও রোগীর পূর্বাপর বিবরণের প্রয়োজন। সাইকোসিসের মত সিফিলিসও বংশানুক্রমিক বা ব্যক্তিগত-ভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে। দোষটি যতই হবে পুরাতন ততই তার চিকিৎসাও হবে কষ্টসাধ্য। রোগী যখন চিকিৎসকের নিকটে আসে, তখন তাকে নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার যে কোন একটিতে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যানিম্যান-কৃত চিররোগের প্রকৃতি ও তাহার প্রতিকার (Chronic Diseases, their Peculiar Nature and their Homœopathic Cure) নামক গ্রন্থে এই কটি কথার উল্লেখ আছে—

১। যখন সিফিলিস একক-রূপে বর্তমান এবং উহার সহিত ক্ষতও বর্তমান রহিয়াছে, অথবা বাহ্যিক ঔষধাদির ব্যবহার দ্বারা ক্ষত শুকাইয়াছে কিন্তু ইহার আর একটি প্রতিনিধি বাগী এখনও বর্তমান আছে।

২। যখন ইহার সহিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় রোগবীজের কোনটিই মিলিত হয় নাই, কিন্তু ইহার স্থানীয় প্রতিনিধি-

লক্ষণ, যথা—বাগী বা ক্ষত অন্যায় ঔষধ দ্বারা অপসারিত করা হইয়াছে।

৩। যখন ইহা আর একটি পুরাতন রোগের অর্থাৎ বিকশিত সোরার সহিত সম্মিলিত এবং স্থানীয়-লক্ষণ এখনও বর্তমান আছে অথবা বাহ্যিক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা উহাকে অপসারিত করা হইয়াছে।

সিফিলিসের পূর্বোক্ত তিনটি অবস্থার কথা জানার সঙ্গে ধাতুগত সিফিলিসের লক্ষণাবলী জানাও প্রয়োজন। যথা—

১। রাত্রে বৃদ্ধি।

২। দেহের গভীরে সিফিলিসের ক্রিয়াকলাপ, যেমন—অস্থি, মজ্জা, রক্ত ইত্যাদিতে তার ছাপ থাকে।

৩। মানসিক অবস্থা হয় শোচনীয়, যেমন—আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা প্রবল ইত্যাদি।

৪। টনসিলের যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত; চর্মে গোলাকার তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ, মুখমণ্ডলে একপ্রকার চুলকানিহীন ফুস্কুড়ি, রাত্রিকালে অস্থিতে ছিদ্রকরবৎ বেদনা ইত্যাদি।

সিফিলিস-দোষটি একক বা একাধিক সংযোগে রোগীর দেহ ও মনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তবে একটা বিষয় হচ্ছে লক্ষ্য করবার। সিফিলিস কখনও সুপ্ত-সোরার সঙ্গে মিলিত হয় না, হয় বিকশিত সোরার সঙ্গে। সোরাকে বিকশিত করার দিকে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্য কোন প্রকার বিসদৃশ চিকিৎসা এর জন্য দায়ী; তখন সিফিলিস চিকিৎসা দুরায়ত্তকর হলেও, অসাধ্য হয় না একেবারে। সাইকোসিসের

সঙ্গে সিফিলিসের সংযোজন বিরল কিন্তু অসম্ভব নয়। এমন কি একত্রে তিনটির অবস্থানও হয়ে থাকে ক্বচিৎ।

সিফিলিস যদিও সোরার মত, ব্যাপকভাবে রোগের সৃষ্টি করে না, তবুও এমন কতকগুলি রোগ আছে, যারা সিফিলিস-জাত। যেমন—নানা জাতীয় উপদংশজ কাউর, টেবিস ডর্সেলিস (tabes dorsalis), জেনারেল প্যারালেসিস অফ ইনসেন (general paralysis of insane), অস্থিক্ষত; উপদংশজ হৃদ্‌রোগ ও আর্টিরিয়েল স্ক্লেরোসিস (arterial sclerosis) ইত্যাদি।

হ্যানিম্যানোক্ত সিফিলিসের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় চিকিৎসা যেমন সহজসাধ্য, তৃতীয়টির বেলায় তেমন নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ সদৃশ-বিধান মতে প্রয়োগ করলে, আরোগ্য হয় সুনিশ্চিতভাবে। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় যখন সিফিলিসের ক্ষত থাকে লুপ্ত, চিকিৎসার সময় তার পুনরাগমন সম্ভব। পরে, যখন তা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, তখন আর কোন লক্ষণই থাকে না, এমন কী ক্ষতস্থানটির বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনটি হয় ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে বি-সম ঔষধ প্রয়োগে রোগলক্ষণের অন্তর্ধান হয়, সেখানে পরিবর্তনটি ঘটে বাহির থেকে ভিতর ভাগে। এটি ক্ষতিকর। আমাদের মনে রাখতে হবে আরোগ্যকরী শক্তির কাজই হচ্ছে ভিতর থেকে বাইরে; এ যদি না হয়, নানানতরো জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। মূলরোগ দূর করা হয় দুঃসাধ্য।

তৃতীয় অবস্থাটির চিকিৎসার কথাই বলবো সংক্ষেপে। পূর্বেই বলেছি, সুপ্ত-সোরার সঙ্গে সিফিলিসের মিলন হয় না; কিন্তু মিলন হয় বিকশিত-সোরার সঙ্গেই। এখানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে অ্যান্টিসোরিক ঔষধপ্রয়োগের, লক্ষ্য রাখতে হবে সর্বাপেক্ষা সদৃশ ঔষধ ব্যবহারের দিকে। অ্যান্টিসোরিকের ক্রিয়া চলবে যতদিন, ততদিন আর কোন ঔষধ দেওয়া শুধু বে-আইনী নয় রীতিমত ক্ষতিকর। অবশ্য উপরিউক্ত এক মাত্রার কাজ শেষ হলে, হয়তো দ্বিতীয় মাত্রা অ্যান্টিসোরিক ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে। এর কাজটিও যেন চলতে পারে অব্যাহত গতিতে। এমনিতরো ভাবে সোরার প্রকোপ হ্রাস হবার পর সুরু হবে সিফিলিসের চিকিৎসা। এখানে নির্ভর করতে হবে সিফিলিসজাত লক্ষণগুলির উপর; দিতে হবে অ্যান্টি-সিফিলিটিক ঔষধ। কিন্তু এ ঔষধেই যে রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময় হবে, এমন কিছু কথা নয়। এরপর হয়তো আবার চক্রাবর্ত-হারে, একবার অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসোরিক চিকিৎসা চলবে, পূর্ণভাবে রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত। যত সহজভাবে চিকিৎসার বিষয়টি বললাম, তত সহজ মনে হয় না, প্রকৃত চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

শেষকালে আর একটি কথা জানিয়ে রাখি। যেখানে তিনটি দোষই একত্রে বর্তমান, সেখানে যদি এমন একটি সদৃশ-ঔষধ প্রয়োগ করা যায় যা হবে একাধারে অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক; তবেই সেখানে সুফল ফলবে। যদি তেমন সাদৃশ্য-সম্পন্ন ঔষধ, বাছাই করবার

ছকে ধরা না পড়ে, তবে পূর্বোক্ত প্রণালীগুলিতেই ঔষধ-বাছাই করে রোগনাশের পন্থাই হচ্ছে উত্তম।

চিকিৎসকের আইনজ্ঞানটুকুই সব নয়, যদি না ঔষধ-পরিচয় জ্ঞান হয় সুসম্পূর্ণ। ঔষধের লক্ষণাবলীকে যেমন নিখুঁতভাবে জানতে হবে, তেমনি তাদের কোনটি অ্যান্টি-সোরিক, অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক, এ জ্ঞানও থাকা চাই সুনিশ্চিতরূপে। তা না জানলে কার্যকালে বেগ পেতে হয় চিররোগের চিকিৎসায়; মনে হয় অন্ধকার ঘরের মধ্যে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আলোকের পথটুকু আর নজরে আসে না কিছুতেই। নিম্নে প্রধান প্রধান ঔষধগুলির দোষগত (miasmatic) পরিচয় লিখলাম, যার ফলে ঔষধ-বাছাই-এর কাজে সুরাহা হবে অনেকখানি।

প্রধান প্রধান অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধাবলী—

অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক	অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক
অরাম মেট	ঐ	ঐ	অ্যান্টিম-ক্রুড	...	...
আর্জেণ্টাম মেট	...	ঐ	এপিস মেল	...	...
আর্জেণ্টাম নাই	...	ঐ	ওপিয়াম	...	ঐ
আর্সেনিক অ্যালব	...	ঐ	**ককুলাস**	...	ঐ
আইওডাম	...	...	কলচিকাম	...	ঐ
অ্যালুমিনা	...	ঐ	**কস্টিকাম**	...	ঐ

অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক	অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক
অ্যামন-কার্ব	...	ঐ	**কার্বো অ্যানি**	...	...
অ্যানাকার্ডি-ওরি	...	...	**কার্বো ভেজ**	...	...
কেলি কার্ব	ঐ	ঐ	নাক্স ভম	...	...
কেলি বাই	ঐ	ঐ	নাক্স মশ্চেটা	..	ঐ
কেলি ক্রোম	...	ঐ	নাইট্রিক-অ্যা	ঐ	ঐ
কুপ্রাম			নেট্রাম-কা	...	ঐ
মেট	...	...	**নেট্রাম-মি**	...	ঐ
কোনিয়াম	...	...	নেট্রাম-সা	..	ঐ
ক্যাল্কে-কার্ব	...	ঐ	ন্যাজা	...	...
ক্লিমেটিস-ই	ঐ	ঐ	**পাইরোজেন**	...	...
ক্যান্থারিস	...	ঐ	পালসেটিলা	...	ঐ
ক্যালিয়া-ল্যা	...	ঐ	প্লাম্বাম	...	ঐ
ক্রোটন-টি	...	...	**পেট্রোলিয়াম**	ঐ	ঐ
ক্রোটেলাস-হ	...	...	**প্ল্যাটিনা**	...	...
গ্র্যাফাইটিস	ঐ	ঐ	ফসফরাস	...	ঐ
চেলিডোনিয়াম	...	...	ফসফরিক-অ্যা	...	ঐ
জিরাম মেট	...	ঐ	ফাইটো	ঐ	ঐ
টিউবারকুলি	ঐ	ঐ	ফেরাম মেট	...	ঐ
টেরিবিন্থ	...	ঐ	ফ্লুওরিক-অ্যা	ঐ	ঐ
ট্যারেন্টুলা	..	ঐ	বার্বেরিস-ভা	...	ঐ
ডালকামারা	...	ঐ	বেঞ্জয়িক-অ্যা	ঐ	ঐ
ডিজিটেলিস	...	...	**বোরাক্স**	...	ঐ

অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক	অ্যান্টিসোরিক	অ্যান্টি-সিফিলি-টিক	অ্যান্টি-সাইকো-টিক
ড্রসেরা	...	...	ব্রোমিয়াম	...	...
থুজা	...	ঐ	ব্যারাইটা-কা	...	...
ভিরেট্রাম-অ্যা	...	...	সিকু-ভি	...	...
ভিরেট্রাম-ভি	...	ঐ	**সাইলিসিয়া**	ঐ	ঐ
মার্ক-সল	ঐ	ঐ	**সালফার**	ঐ	ঐ
মার্ক-কর	...	ঐ	সালফু-অ্যা	ঐ	...
মিউরি-অ্যাসি	ঐ	...	সিকেল-ক	...	...
মিলিফো	...	...	সার্সাপ্যা	...	ঐ
মেজেরিয়াম	ঐ	...	**সিনাবেরি**	...	...
মেডোরিনা	ঐ	ঐ	সিপিয়া	ঐ	ঐ
ম্যাগ-কার্ব	...	ঐ	সিফিলিনাম	ঐ	ঐ
ম্যাগ-ফস	...	ঐ	স্পঞ্জিয়া	...	...
ম্যাগ-মি	..	ঐ	স্পাইজি	...	...
রডোড্রেনডন	...	ঐ	স্ট্যানাম	...	...
রাস-টক্স	...	ঐ	স্ট্যাফিসে	ঐ	ঐ
রুটা	...	ঐ	সেলিনি	...	ঐ
র‍্যাটানহিয়া	...	ঐ	**স্যানিকু**	...	...
লাইকো	ঐ	ঐ	স্যাঙ্গুইনেরি	...	ঐ
লিলি-টাই	...	ঐ	স্যাম্বুকাস	...	...
লিডাম	...	ঐ	**সোরিনাম**	...	ঐ
ল্যাক ক্যান	ঐ	ঐ	হাইড্রাস্টিস	ঐ	...
ল্যাকেসিস	ঐ	ঐ	**হিপার-সা**	ঐ	...

ষষ্ঠ অধ্যায়

চক্রাবর্ত-প্রণালী—(৩)

সোরা

সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষ দুটির ঔষধ-বাছাই প্রণালীর ভিতর দিয়ে যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা অবশ্যই লক্ষণীয়। উপর্যুক্ত চিকিৎসা-ধারাটিকে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করলেই, ঔষধ বাছাই করা হবে সহজসাধ্য এবং দোষ দুটিকেও উৎখাত করা যাবে সমূলে। কিন্তু ঐ দুটি স্বল্পায়াসসাধ্য দোষ দূর করবার ঔষধ-বাছাই প্রণালীটি জানবার পর, আর একটি প্রবলতম রোগবীজের ঔষধ নির্বাচন তথা চিকিৎসার বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় সর্বাধিক। উক্ত দোষটি হচ্ছে বহুমুখী ড্রাগনের মত ভয়ঙ্কর। কাজেই, তার সঙ্গে লড়াই করার কাজটাও যেমন বুদ্ধি-বিচার-সময় সাপেক্ষ, তেমনি ঔষধ বাছাই-এর বেলাতেও দরকার হয় দক্ষতার। সেই প্রচণ্ড সোরা দোষটির কথাই কিছু বলবো এখানে। শত্রুর পরিচয়টা পুরোপুরি জানবার পরই, সুবিধা হবে তার জন্য মৃত্যুবাণ অনুসন্ধান করার।

সোরার ঔষধ-বাছাই করার সময় নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ; তবেই তো সম্ভব হবে সোরা বিনাশ করা :—

১। সোরার প্রাথমিক অবস্থায় যখন চর্মোদ্ভেদ বর্তমান

থাকে, তখনই তার উপযুক্ত অ্যান্টিসোরিক বা সোরাঘাতী ঔষধের অনুসন্ধান করা।

২। সোরার আদিমাবস্থাটিকে চিনতে হলে সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন যে—

(ক) সঙ্গমসুখের ন্যায় সুখকর চুলকানি।

(খ) সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে উক্ত চুলকানির বৃদ্ধি; এবং

(গ) চুলকাইবার পর জ্বালা, ইত্যাদি আছে কি-না—এবং তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া।

৩। সোরার বাহ্যলক্ষণ (চুলকানি ইত্যাদি) লোপের পর, ধাতুগত ব্যাধিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে, গৌণ লক্ষণ-সমূহের প্রতি ওয়াকিবহাল হওয়া।

৪। সুষুপ্ত সোরার লক্ষণাবলী সঞ্চয় করা।

৫। বিকশিত-সোরার প্রকাশকাল নির্ধারণ করা; অর্থাৎ কতদিন ধরে বিকশিত-সোরা রোগীর ক্ষতিসাধন করছে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।

৬। সোরার বিকশিত অবস্থাটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা—প্রত্যেকটি রোগলক্ষণের প্রকাশকালের সন্ধান লওয়া এবং তার স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রভাব সম্বন্ধে চিন্তা করা।

৭। সোরার ধারাবাহিক রূপটির অনুসন্ধান করা এবং পরিবর্তনের সঙ্কেতটি গ্রহণ করা।

৮। সোরা এবং অপরাপর 'মায়াজমের' মিশ্রণাবস্থার—এবং কোন্ 'মায়াজমের' (miasm) প্রভাব বেশী বা কম, রোগী-চিকিৎসার সময়—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

৯। সুপ্ত সোরাকে বিকশিত করার যে আদিম কারণ থাকে, তার খোঁজ লওয়া।

১০। রোগী-চিকিৎসাকালে আহার-বিহারাদির বিধি-নিষেধ বিষয়ে রোগীর প্রতি কড়া নজর দেওয়া।

১১। বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ বা বিসদৃশ ঔষধ ব্যবহার বিষয়ে রোগীকে নিষেধ করে দেওয়াও চিকিৎসকের একান্ত কর্তব্য।

উপর্যুক্ত বিষয়ে চিকিৎসকের জ্ঞান যদি না থাকে পুরোমাত্রায়, তবে হোমিওপ্যাথিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো যায় না যথাক্ষেত্রে। সোরার ক্রিয়া শুধু সুদূর-প্রসারীই নয়; উত্তরোত্তর পরিবর্তনশীলও। তজ্জন্য সোরা-বিষয়ে চিকিৎসকের জ্ঞান হওয়া চাই যথেষ্ট; নচেৎ নিষ্ফলতা দেখা দেবে বারে বারে।

সোরার লক্ষণ আছে বহু রকমের। তাই সোরাকে চেনা যায় সহজেই। হ্যানিম্যানের ক্রনিক ডিজিজেস (Chronic Diseases) পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে উক্ত লক্ষণাবলীর পুনর্লিখন নিষ্প্রয়োজন। সোরার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় শুধু দেহের বহির্ভাগে নয়, অন্তর্ভাগেও। সেই ছাপগুলির কথাই হ্যানিম্যান উল্লেখ করেছেন বিশদভাবে।

সোরান্তর্গত রোগবিশেষেরও একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে সকলের নামোল্লেখ করাও প্রায় অসম্ভব। কারণ, এমন কোন দেহযন্ত্র নেই, যেখানে সোরা কার্য করতে অপারগ। হ্যানিম্যান "অর্গাননের" ৮০ অণুচ্ছেদে তার একটা

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তালিকা দিয়েছেন। সে তালিকাটির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই এখানে।

সোরার নামাবলী জানা থাকলেই যে, তার চিকিৎসার বিশেষ কিছু সুরাহা হবে, তা নয়। কেবলমাত্র সোরার প্রচণ্ডতা ও বিশালতার কথাটাই আমাদের মনে পড়ে উক্ত নামাবলী থেকে। এক বা একাধিক রোগের মিশ্রাবস্থাটি সোরা দোষের প্রখরতার পরিচায়ক। অতএব, ঐ সমস্ত দিক বিচার করে সোরার ঔষধ-নির্বাচন করতে হবে, আমাদের নিয়মানুগ পন্থা অনুসরণের দ্বারা। তবেই পৌঁছানো যাবে সফলতার সিংহদ্বারে।

ঔষধ-বাছাই-এর সুবিধার্থে সোরা দোষটিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—

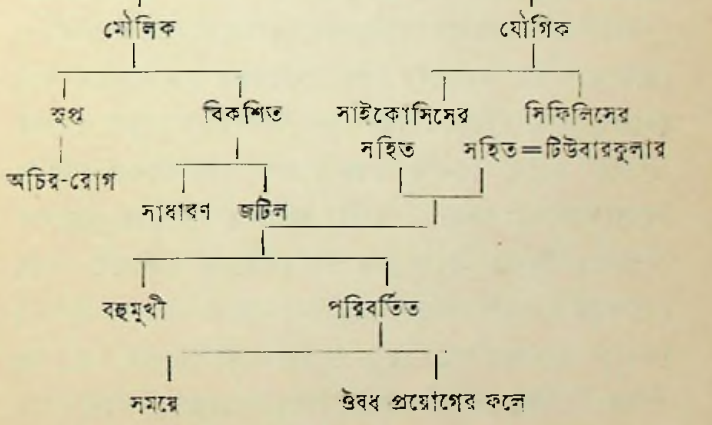

উপর্যুক্ত চার্ট (chart) বা তালিকাটি থেকে সোরার ধারাবাহিকতাটি লক্ষ্য করবার। এক্ষণে, আমাদের রোগী চিকিৎসার সময় দেখতে হবে, রোগীটি বর্তমানে সোরার কোন্ শ্রেণীতে রয়েছে, অর্থাৎ সোরার মূল তার কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে। যদি রোগীটি সোরার জটিলতার ভিতর গিয়ে থাকে, তবে তার চিকিৎসা করা যেমনি কষ্টসাধ্য তেমনি সময়-সাপেক্ষ। আর তদ্‌নিম্ন স্তরেও যদি সোরা তার শিকড় চালিয়ে থাকে, তবে পরিবর্তিত রূপটি হবে আরও ভয়ঙ্কর এবং দুশ্চিকিৎস্য। উক্ত পরিবর্তিত রূপটি যদি দীর্ঘ সময় ধরে ভোগার ফলে এসে হাজির হয় তবে তার জন্য আরোগ্যের আশা করতে পারা যায়; কিন্তু পরিবর্তিত জটিল অবস্থাটি যদি ঔষধ-জনিত হয়, তবে চিকিৎসার ফল হবে নৈব নৈব চ। এক্ষেত্রে হ্যানিম্যান দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করে গেছেন যে রোগীটি প্রায় চিকিৎসার বহির্ভূত।

চিকিৎসার বেলায় রোগীদেহে সোরাকে যে অবস্থায় বা শ্রেণীতে পাচ্ছি, আমাদের ঔষধ-প্রয়োগেরও সুরু হবে সেইখান থেকেই। এবং চিকিৎসার ফলে রোগীর আরোগ্য যেমনি এগিয়ে চলবে, তেমনি ঔষধ-প্রয়োগ বিদ্যাটিকেও কাজে লাগাতে হবে ঠিকমত। রোগীর অবস্থা যদি দাঁড়ায় এসে সর্ব নিম্নস্তরে, অর্থাৎ ঔষধজনিত পরিবর্তনের ভিতরে, তবে সেক্ষেত্রে নিঃসংশয়ভাবে নির্ভর করা চলে না ঔষধের উপর; সেখানে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না প্রায়ই। কিন্তু সে পরিবর্তন যদি হয় সময়ের ব্যবধানে, তবে

সেখানে ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে যথেষ্ট দক্ষতা ও বিবেচনার সঙ্গে। এখানে ঔষধ নির্বাচনের কাজ করতে হবে কতকটা রুটিন মাফিক। কারণ, রোগ যখন পরিবর্তনের মধ্যে [অর্থাৎ প্যাথলজিক্যাল (pathological) পরিবর্তন, যথা—তন্তু বা tissue ইত্যাদির বিনাশ বা অহেতুক বৃদ্ধি] চলে যায়, তখন লক্ষণাবলীর সঙ্কোচন ঘটে। চলতি কথায় বলতে গেলে, বলতে হয় যে, সে অবস্থায় প্রকৃত ঔষধ-নির্ণায়ক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না প্রায়ই। কেবলমাত্র কতকগুলি রোগ-নির্ণায়ক প্যাথলজিক্যাল লক্ষণই রোগজীর্ণ দেহের ভগ্নাবশেষের সাক্ষ্য দেয় প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে। উক্ত অবস্থায় চিকিৎসা করা মানেই, আরোগ্য-নিকেতনের কার্নিশে দাঁড়িয়ে কাজ করার সামিল। অর্থাৎ চিকিৎসায় একটু অসতর্কতার ফলে বিফলতা সুনিশ্চিত।

যাই হোক, ঔষধ-নির্বাচনের বেলাতেও আমাদের নির্ভর করতে হবে ঐ সব প্যাথলজিক্যাল লক্ষণের উপরেই। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, প্যাথলজিক্যাল লক্ষণেরও একটা মূল্য আছে,—যেটা অনিতরো একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আঁকড়ে ধরবার মত অবলম্বন হয় মাত্র। এমতাবস্থায় চিকিৎসা করতে হলে সর্বাগ্রে জানা দরকার ঔষধের প্যাথলজিক্যাল লক্ষণাবলী। একটি রোগী-চিকিৎসার মাধ্যমে বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা গেল। একটি স্বাস্থ্যবান সুশ্রী ব্যক্তির কপালে একটি গোল চাকতি পরিমাণ দাদ (ring worm) ছিল, চাঁদের কলঙ্কের মতোই মুখটি দেখতে হয়েছিল বিশ্রী রকমের। কিন্তু তার মধ্যে

না ছিল কোন চুলকানি, না ছিল স্পর্শাধিক্যতা বা স্পর্শ-বিলুপ্তি। ব্যাপক-লক্ষণ লওয়া হল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, কিন্তু ঔষধ-নির্ণয়ের সহায়ক হল না একটাও। সিপিয়া ঔষধে প্যাথলজিক্যাল লক্ষণের স্তরে উক্ত প্রকার গোল দাদের পরিচয় আছে জেনে, সিপিয়া দেওয়া হল যথেষ্ট সংশয়তার সঙ্গে। দীর্ঘ ৩।৪ মাসের ব্যবধানে সে দাগটুকু মিলিয়ে গেল বেমালুম ভাবে। এটি যে একেবারে প্যাথলজিক্যাল লক্ষণানুযায়ী ঔষধ-বাছাই-এর ফল, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওরূপ অবস্থায় আর গত্যন্তরই বা কী?

উক্ত প্যাথলজিক্যাল লক্ষণাবলীর সাহায্যে অর্বুদ (tumours), শ্লীপদ (elephantiasis), ফোড়া ইত্যাদির ঔষধ-নির্বাচনের সুবিধা হয় অনেক সময়েই। শুধু তাই নয়, রোগের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের স্থিতিশীল (static) অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে, ওদের উপর নির্ভর করাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। পরে রোগ যখন তার গতিশীল (dynamic) অবস্থায় ফিরে আসে, অর্থাৎ নানানতরো লক্ষণ-উৎপাদনের ক্ষমতা ফিরে পায় আমাদের জীবনীশক্তি, তখনই আমরা আরোগ্যের এক ধাপ এগিয়ে যাই। সোরা তখন তার জটিল অবস্থাটিতে গিয়ে হাজির হয় ঔষধের সুকার্যকারিতার ফলে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, উপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগের ফলে তার পরিবর্তিত অবস্থাটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলেও, রোগী অন্য কোন ক্ষতি বা নূতন কোন পরিবর্তনের আশঙ্কা থেকে মুক্তিলাভ করে সুনিশ্চিতভাবে।

যেমন কোন একটি ব্যক্তির দেহে অর্বুদ দেখা গেছে এবং অর্বুদ-সৃষ্টির প্রবণতাও বর্তমান আছে সেই সঙ্গে,—এ বিষয়ে চিকিৎসকও নিঃসন্দেহ হয়েছেন, রোগীর ইতিহাস ও জবানবন্দী থেকে। সেক্ষেত্রে, ঔষধ প্রয়োগের ফলে তার অর্বুদটি ধ্বংস-প্রাপ্ত যদি না-ই হয়, কিন্তু 'প্রবণতা' দোষটি ধ্বংস হবে নিঃসংশয়ে। প্যাথলজিক্যাল লক্ষণাবলী দূর করা ঔষধের কার্য নয়; ঔষধের কার্য হচ্ছে, অপক্রিয়াশীল জীবনীশক্তিকে তার সুস্থপথে পরিচালনা করা। সেটুকু করতে পারলেই, জীবনী-শক্তিকে তার দীর্ঘ সময়ের সদ্ব্যবহারে হয়তো প্যাথলজিক্যাল লক্ষণ দূর করতে পারে বলেই অনেক চিকিৎসকের ধারণা।

সোরার পরিবর্তিত অবস্থাতে কখনও কখনও, হয়তো ২।১টি লক্ষণমাত্র বর্তমান থাকে। সেটা pathogenetic symptom বা রোগোৎপাদিত লক্ষণ এবং pathognomonic symptom বা বিশিষ্ট লক্ষণের যে কোন একটির হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এ ক্ষেত্রে রোগীর বৈচিত্র্য জানা যায় না, কেবলমাত্র রোগীর একটি নির্ভরযোগ্য লক্ষণের কথাই জানা যায়। হ্যানিম্যান এই শ্রেণীর লক্ষণ-জ্ঞাপক রোগের নাম দিয়েছেন one-sided disease বা একাঙ্গিক রোগ। এসব ক্ষেত্রে ঔষধ বাছতে হলে, উক্ত লক্ষণের সদৃশ-লক্ষণ পাওয়া যাবে যে ঔষধের মধ্যে, সেটিই হবে সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। এই ঔষধটি যদি হয় antipsoric বা সোরাঘ্ন-শ্রেণীর, তবেই প্রয়োগের ফলে আরোগ্যপথ পরিষ্কার হবে অনেকখানি।

সোরার আর একটি রূপ হচ্ছে বহুমুখিতা। এখানে একই

রোগীদেহে সোরা বহু রোগের সমন্বয় ঘটায়। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিকশিত সোরার জটিল অবস্থাটিতে বহু নামধেয় রোগের মাধ্যমে, সোরা জানিয়ে দেয় তার বহুমুখিন অস্তিত্ব। মূলে, সেই একই সোরা, কিন্তু তার লক্ষণসমষ্টির ভিতর দিয়ে সে হয়ে পড়ে বহু। রোগজীর্ণ ব্যক্তির যন্ত্রে রোগের ব্যাপকতা ধরা পড়ে, ধরা পড়ে তার শোচনীয় অবস্থাটি। আমি দেখেছি, একই ব্যক্তির দেহে সোরিয়েসিস (psoriasis), একজিমা (eczema), ফাইলেরিয়া (filaria) এবং অর্শের প্রকোপ। আবার এমনও প্রায় দেখা যায় যে, একই রোগীর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী এবং স্নায়ু ইত্যাদি বিশিষ্ট যন্ত্রসমূহ একই সময়ে সমানভাবে পীড়িত। শুধু chronic disease বা চিররোগের ক্ষেত্রেই সোরার বহুমুখিন রূপটি ফুটে বেরোয়, তাই নয়, acute disease বা অচিররোগের বেলাতেও ঠিক অমনিতরো হতে দেখা গেছে কখনও কখনও। যাই হোক, সোরার বহুমুখিনতার কথা বলাই লেখাটির উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুমুখী সোরার ব্যাপক ক্ষেত্রে ঔষধ-বাছাই প্রণালীটি হবে কেমনতরো, তারই আলোচনা করা।

বহুমুখী সোরার চিকিৎসার বেলাতে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে, সোরার প্রধান মূল কোন্‌টি। সেটি দেখবার পন্থা হচ্ছে, বিকশিত-সোরা দোষটির আদ্যন্তের—প্রাথমিক আক্রমণ থেকে সুরু করে বর্তমান অবস্থাটির—ইতিহাস গ্রহণ করা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে। এখানেই ধরা পড়বে সোরা কেমন করে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে এসে, রোগীকে টেনে এনেছে বর্তমান দুরবস্থায়।

যাই হোক, রোগীর দেহে সোরার আদি মূল বললে বুঝতে হবে, তার আদিম বিকশিত রূপটি। কিন্তু আমরা রোগীকে যে অবস্থায় পেয়েছি, তখন সে বিকশিত সোরার আদিম অবস্থাটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। কাজেই, একেবারে মূলে টান দেওয়া শক্ত ব্যাপার; কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের লক্ষ্য থাকবে উক্ত মূলোৎপাটন করা। এরপর, রোগীক্ষেত্রে সোরার বহুমুখী অবস্থাটিতে ঔষধ-নির্বাচনের সমস্যাটাই আসল।

রোগীর ইতিহাস এবং বর্তমান লক্ষণাবলীর উপর ভিত্তি করে, এমন একটি সদৃশ অ্যান্টিসোরিক ঔষধ বাছতে হবে লক্ষণকোষের ভিতর থেকে যেটি রোগীক্ষেত্রে মূল সোরা-বিনাশী বা antipsoric ঔষধের কাজ করবে অবিসংবাদিত ভাবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে রোগীর মূল ঔষধ থাকবে কেবলমাত্র একটি, যে কেবলই চেষ্টা করবে সোরাকে পিছু হটিয়ে দেবার। কিন্তু তার সহযোগী হিসাবে হাত মিলাতে পারে আরও ২।১টি ঔষধ, যাদের প্রয়োগ করা হবে কেবলমাত্র তখনই, যখন রোগীদেহে প্রকাশ পাবে অন্য কোন রোগের। সহযোগী ঔষধগুলিও নির্বাচন করতে হলে, লক্ষ্য রাখতে হবে লক্ষণা-বলীর উপর। এবং সহযোগী ঔষধটির যেন মূল ভেষজের পরিপূরক হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আর একটি কথা এখানে বলা দরকার, মূল ঔষধটি দেওয়া হবে উচ্চ শক্তিতে, কিন্তু সহযোগী ঔষধটি প্রয়োগ করতে হবে নিম্ন-শক্তিতে। উদ্দেশ্য, যেন একে অপরের ক্রিয়াতে বাধা না দেয়।

অনেক সময়েই এমনিতরো উপায়ে রোগীর আরোগ্যকাল ত্বরান্বিত হয়। যদি মূল ঔষধের পরিপূরক হিসাবে, কোনও সদৃশ-সহযোগী অ্যান্টিসোরিক ঔষধ না-ই মেলে, তবুও সেটি যেন সমতুল্য ঔষধ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অন্ততঃপক্ষে। আর এক বিষয়ে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মূল ঔষধের কোন ক্রিয়াঘাতী ঔষধ, যেন কোন রূপেই বাছাই করা না হয় সহযোগী ভেষজের ছদ্মবেশে। তা হলেই, সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

পরিবর্তিত এবং বহুমুখী রূপটি থেকে সোরা তার জটিল অবস্থায় ফিরে যেতে পারে সুষ্ঠু ও সদৃশমতে চিকিৎসার ফলে। কারণ সুপথে চালিত আরোগ্যের গতিটি হচ্ছে সর্বদাই পশ্চাদ্‌গামী। যখন রোগীটি উক্ত জটিল অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছবে, তখন চিকিৎসকের কর্তব্য হচ্ছে রোগীর লক্ষণ-সমূহকে বিচার করে দেখা তাদের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিমাপে। কোন্ লক্ষণের উপর কতখানি মূল্য দেওয়া দরকার, সেটি ঠিক করতে হবে এই সময়েই। কারণ, সোরা অনেক সময় অবিকৃত থাকে না, অন্যান্য দোষের সংমিশ্রণে রোগের অবস্থাটিকে জটিল করে তোলে। তা ছাড়া সোরার প্রখরতাও বৃদ্ধি পায় রোগীর দেহে ও মনে।

জটিলাবস্থায় সোরার লক্ষণচয়কে ভাগ করা যেতে পারে তাদের বিস্তৃতি ও গভীরতার ব্যাপকতায়। লক্ষণের বিস্তৃতি বলতে বোঝায় যে, লক্ষণটি রোগীদেহে কোন্ কোন্ অঙ্গে ছড়িয়ে আছে এবং গভীরতা হচ্ছে তার ক্ষয়-ক্ষতির মাপকাঠি।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক লক্ষণেরই উপযুক্ত বিশ্লেষণের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, ঔষধ-বাছাই করার দিক দিয়ে। সব লক্ষণই যে সমান ক্ষতিকারক হবে এবং তার ব্যাপ্তি হবে বহু বিস্তৃত, এমন কিছু কথা নয়। ইতরবিশেষ থাকবেই লক্ষণ-প্রকাশের স্তরে। কারও হয়ত ব্যাপকতা অধিক, গভীরতা কম, কারও বা পাওয়া যাবে তদ্বিপরীত অবস্থা। লক্ষণকে এমনিতরো যাচাই করলে, তবেই তো জানবার সুবিধা হবে কোন্ লক্ষণের গুরুত্ব অধিক এবং কোন্ কোন্ লক্ষণের উপর নির্ভর করে ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করবো, যার ফলে ঔষধটি পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহের সঙ্গে। ঔষধ-বাছাই প্রণালীর দিক দিয়ে এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। পার্থক্যকরণের মধ্যেই হবে তুলনামূলক বিচার। কেমনভাবে তুলনা করতে হবে, লাক্ষণিক-গুরুত্বের বাটখারায় একটি ঔষধের সঙ্গে আর একটির, সেই কথাই বলবো এরপর।

লক্ষণের বিস্তৃতি নির্ভর করে সোরার ক্ষমতানুযায়ী। যে-যে অঙ্গগুলি থাকে দুর্বল, সেগুলিতেই হয় সোরার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। যে লক্ষণাবলী বের হয় কোন প্রয়োজনীয় যন্ত্র-বিশেষে, সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। লক্ষণাবলীর প্রকাশের উপর তাদের গুরুত্ব বিচার করা যেতে পারে বহিরঙ্গের লক্ষণাবলী অপেক্ষা অন্তরঙ্গের লক্ষণাবলী, নিম্নাঙ্গের অপেক্ষা ঊর্ধ্বাঙ্গের এবং দৈহিক অপেক্ষা মানসিক লক্ষণসমূহ অধিক গুরুতর। লক্ষণ-প্রকাশের স্তরভেদেও তাদের লক্ষণ-সমূহকে গুরু, গুরুতর ও গুরুতমের কোঠায় বিভক্ত করা দরকার

সেই সঙ্গে। আর একটি কথা এখানে বলা দরকার—একাঙ্গিক লক্ষণাপেক্ষা সার্বাঙ্গিক লক্ষণের মূল্য অধিক। ঔষধ-বাছাই-এর বেলা খেয়াল রাখতে হবে যে, যে লক্ষণের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা গুরুতম, সে লক্ষণটিই হবে ঔষধের কেন্দ্রগত-লক্ষণ। অর্থাৎ, যে ঔষধে রোগীর উক্ত গুরুতম লক্ষণটি বর্তমান, সেই লক্ষণগত-ঔষধটিই হবে এক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। যেমন, মস্তকের যন্ত্রণাধিক্য যদি পেটের পীড়াপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয়, তবে যেন যন্ত্রণাসূচক লক্ষণটিকে এক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। পেটের পীড়াটিকে ধরতে হবে আনুষঙ্গিক লক্ষণের পর্যায়ে। ঐ একই নিয়মে আমরা মানসিক লক্ষণের বিচারে দৈহিক-লক্ষণকে অবহেলা করতে পারি খানিকটা।

লক্ষণের গভীরতা বলতে বোঝায় যে, কোন্ লক্ষণটি দেহীর কী পরিমাণ ক্ষতিকারক অথবা কী স্তর পর্যন্ত তার ক্ষতির ব্যাপ্তি হয়েছে ইতিমধ্যে। লক্ষণের গভীরতাটিকে কয়েকটি দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। প্রত্যেকটি লক্ষণকে তার (১) স্থায়িত্বকাল, (২) যন্ত্রণার আধিক্য-অনাধিক্য এবং (৩) দেহ ও মনোগত পরিবর্তনের স্তর অনুযায়ী ভাগ করা যায়। যে লক্ষণের স্থায়িত্ব যত অধিক, তার গভীরতাও হবে তদনুপাতে বেশী। সোরার দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণাবলী রোগীর ক্ষতিকারক দলের অন্যতম। এখানে বুঝতে হবে যে, সোরার মূল রীতিমত অন্তঃপ্রবিষ্ট। এক্ষেত্রে কালব্যাপী-লক্ষণটি গভীরতার তথা সোরার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাপক।

গভীরতা-সূচক লক্ষণাবলীর গণ্ডীতে পড়বে সেই লক্ষণগুলি,

যাদের যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা সর্বাধিক। যন্ত্রণার আধিক্যের মাপকাঠিতে সোরার গভীরতা মাপা সহজ।

গভীরতা-জ্ঞাপক লক্ষণাবলীর আর একটি হচ্ছে এই যে, দেহ ও মনের যত গভীর স্তর থেকে যে লক্ষণটি বের হয়, সেটিই তত গভীরতা নির্দেশক। এখানে রোগলক্ষণের বিস্তৃতির সঙ্গে গভীরতার পার্থক্য সামান্য হলেও ;—ঔষধ-বাছাই-এর বেলায়, ঐ ধরনের লক্ষণাবলী, দুই-এর (গভীরতা ও বিস্তৃতির) সমন্বয়ে অসামান্যের রূপ ধরে।

লক্ষণের গভীরতাকে কেন্দ্র করে ঔষধাবলীর তুলনামূলক পার্থক্য বের করা দরকার। যে লক্ষণটি যত গভীর, তার মূল্য ততই বেশী। সেই মূল্যবান্ লক্ষণটি যে ঔষধের মধ্যে মিলবে, সেই ঔষধটিই হবে সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য। লাক্ষণিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ঔষধ-বাছাই-এর এ দিকটা বিশেষ লক্ষণীয়। অন্যান্য বহু অপ্রয়োজনীয় লক্ষণের অনুসরণে ঔষধ-বাছাই করা অপেক্ষা কয়েকটি বিস্তৃত ও গভীরতা জ্ঞাপক লক্ষণের সাহায্যে ঔষধ-বাছাই করা রোগারোগ্যের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এমনিভাবে লক্ষণাবলীকে যাচাই না করলে, জটিল অবস্থাটিকে এগিয়ে দেওয়া শুধু শক্তই নয়, অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়কও। হোমিওপ্যাথির ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার আরোগ্যদায়ক ক্ষমতাটি সর্বদাই একটি ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিক পথের উপর দিয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা ও নিঃসংশয়তার সঙ্গে আরোগ্যের সিংহদ্বারে নিয়ে যায়।

এখানে একটি রোগীলিপির সাহায্যে লক্ষণের গভীরতার

উপর নির্ভর করে ঔষধ-বাছাই-এর ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছি। রোগীর বয়স ২০ বৎসর। পাতলা গৌরবর্ণ চেহারা। ঠাণ্ডা লাগে সহজেই। কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, আর কী শীত—সর্ব-ঋতুতেই সর্দি-কাশি তার নিত্য সঙ্গী। পিতা হোমিওপ্যাথ, কাজেই ঔষধও দেওয়া হচ্ছে সর্বক্ষণই এবং প্রতিবারই সর্দি-কাশি আরোগ্য (?) হচ্ছে যথারীতি। রোগী শীতকাতর, কোষ্ঠবদ্ধ। প্রবল খোস-পাঁচড়ার ইতিহাস আছে রোগীর নিজের এবং পূর্বপুরুষের দিক থেকেও। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধা কম। লবণপ্রিয়। মাছ-মাংসে বীতস্পৃহ। একবার হঠাৎ শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে, ভয়ানক কাশির উপদ্রব হল তার। শুকনো কাশি। এক এক দমকায় কাশি হতো ৩।৪ মিঃ ধরে, পরে বিরতি খানিকক্ষণ; আবার কাশি। রাত্রি দিবস কাশির তীব্রতা প্রায় সমান। সে এক অসহকর অবস্থা। সে সব সাধারণ ঔষধে পূর্বে পূর্বে নিবৃত্তি হতো, এবার তাদের প্রয়োগ হল নিষ্ফল। রোগীকে নিয়ে এলেন তার পিতা। ঔষধের তালিকা দিলেন—যাদের প্রয়োগ করেছেন নিষ্ফলতার সঙ্গে। রোগীর কাশির মূলটি লক্ষ্য করলাম—যেটি গভীরভাবে রোগীর মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট। আমি প্রয়োগ করলাম টিউবারকুলিনাম ২০০। উক্ত ঔষধের একমাত্রা প্রয়োগেই কাশির বিলোপ হল অভূতপূর্বভাবে। শুধু তাই নয়, সর্দি-কাশির প্রবণতাটিও দূর হয়ে গেল একেবারে। পরে অবশ্য আর একমাত্রার প্রয়োজন হয়। সেই রোগীই গ্রীষ্মে সকাল সন্ধ্যা স্নান করেছে, বর্ষায় ভিজেছে, শীতে কাবু হয় নি পূর্বের

মতো। সর্দি-কাশির উৎপাত ভোগ করে নি আর গত কয়েক বছর। রোগ আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু রোগীর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হিসাবে রোগটিকে অবহেলা করা চলে না নিশ্চয়ই। এখানে কাশির উৎপত্তি-স্থল সামান্য ঠাণ্ডা-জনিত নয় কখনই, উৎপত্তি-স্থলটি রীতিমত গভীর। কাশিটি সোরার প্রচণ্ডতার একটি জটিল অবস্থাবিশেষ। যতক্ষণ না সে দিকে নজর দেওয়া হল, ততক্ষণ ঔষধ কার্যকরী হয় নি মোটেই। এক্ষেত্রে কাশি লক্ষণটি সোরার গভীরতা-সূচক; যা ঔষধ-বাছাই-এর বেলা অবহেলা করা চলে না কিছুতেই। প্রয়োজন হচ্ছে লক্ষণ-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী; নইলে তীরে এসেও তরী ডুববে।

সোরাকে জটিল করে তোলার দিক দিয়ে সিফিলিস ও সাইকোসিসের হাত অনেকখানি। যদি কোন রোগীদেহে বিকশিত সোরার সঙ্গে সিফিলিস বা সাইকোসিসের অথবা একত্রে উভয়ের যোগ হয়, তবে উক্ত অবস্থাটি হয়ে পড়ে রীতিমত জটিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটি দোষেরই প্রাবল্য দেখা যেতে পারে একত্রে। সে কথা পূর্বেই বলেছি। এখানে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে চক্রাবর্ত-প্রণালীতে। যে দোষটির প্রাধান্য দেখা দেবে যখন, তখনই সেই দোষ-বিনাশী একটি সদৃশ-ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এমনিতরো উপায়ে কয়েকটি অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে ক্রমান্বয়ে। চক্রাবর্ত-প্রণালীতে চিকিৎসার কথা পূর্বেই বলেছি।

এখানে সোরার সংমিশ্রিত রূপ থেকে একটি নূতন দোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যে বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-স্রষ্টা হ্যানিম্যান কোন আভাস না দিলেও, অন্যান্য কয়েকজন মনীষী চিকিৎসক এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, নিজেদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে। দোষটি হচ্ছে টিউবারকুলার (tubercular) = সোরা + সিফিলিস। টিউবারকুলার দোষটির স্বতন্ত্রতা না থাকলেও, অন্য দুটি প্রখর দোষ-সাঙ্কর্যের ফলে, এর ক্ষমতা হয় অসীম। কিন্তু তবুও এটি অন্য দোষ কয়টি অপেক্ষা বিভিন্ন ধরনের। যেমন মৌলিক অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দুটি বিভিন্ন বস্তু, রাসায়নিক একত্রীকরণের ফলে, যে যৌগিক বস্তুটি উৎপন্ন করে, সেটি যেমন না অক্সিজেন, না হাইড্রোজেনের রূপ বা গুণ প্রকাশ করে অন্য একটি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়; টিউবারকুলার দোষটিও স্থূলত সেই প্রকার। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার ক্ষেত্র এ নয়। টিউবারকুলার দোষযুক্ত রোগীকে চেনবার উপায় হচ্ছে, তার সর্বদিক দিয়ে ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা। ক্ষয়িষ্ণুতা বদ্‌গুণটি তার চর্মে প্রকাশ পেলে বলা হয় সোরিয়েসিস (psoriasis), অস্থিতে তার হদিশ মিললে বলা হয় অস্থি-র যক্ষ্মা বা bone T. B. এবং ফুসফুসের ক্ষয়িষ্ণুতার নাম দেওয়া হয়েছে রাজযক্ষ্মা। মূলত উক্ত রোগগুলি একই দোষের বিভিন্ন রূপে বহিঃপ্রকাশ হয় বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে। ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষণটি ব্যতীত আর কয়েকটি লক্ষণও আছে, যারা টিউবারকুলার দোষের ইঙ্গিত দেয়। যেমন গলার কয়েকটি শৃঙ্খলাবদ্ধ গ্রন্থির বৃদ্ধি,

শীতকাতরতা, লম্বা পাতলা চেহারা, সর্দিকাশির প্রবণতা, লালাভ ঠোঁট ইত্যাদি।

টিউবারকুলার দোষযুক্ত রোগীর ঔষধ-বাছাই-এর বেলা নজর রাখতে হবে সেই সব ঔষধগুলির প্রতি যে-গুলিতে অ্যান্টিসিফিলিটিক ও অ্যান্টিসোরিকের যুগ্ম-সমন্বয় ঘটেছে। চিকিৎসাকালে কোন্ দোষটির প্রভাব কতখানি, তাঁর উপর নির্ভর করছে ঔষধের তুলনামূলক বিচার। রোগীদেহে যে দোষের প্রভাব বেশী, সেই দোষঘ্ন প্রধান ঔষধই (তৎসঙ্গে অপর দোষটিও বর্তমান থাকা চাই) উচিত হবে সর্বাগ্রে ব্যবহার করা। মোট কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রোগীর দোষগত প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য। অ্যান্টিটিউবারকুলার (antitubercular) ঔষধাবলীর নাম নীচে দেওয়া হল :—

আইওডিয়াম	*টিউবারকুলি	*ব্যারাইটা কার্ব
আর্স-আইওড	ডালকামারা	ব্রোমিয়াম
*কেলি আইওড	ড্রসেরা	মিউরিয়েটিক অ্যাসিড
কেলি ফস	নেট্রাম-মি	মিলিফোলিয়াম
	নেট্রাম স্যালি	ম্যাঙ্গানাম অ্যাসেটি
কার্বো-অ্যানি	নেট্রাম সালফ	ম্যাগ-কার্ব
*ক্যাল্কে-কার্ব	*ফসফরাস	ম্যাগ-মিউর
কোনিয়াম ম্যাকু	ফসফরিক অ্যাসিড	ম্যালেরিয়া অফি
ক্রোটেলাস হরি	ফেরাম ফস	রিউমেক্স
গুয়েকাম	*ব্যাসিলিনাম	র‍্যানানকু-বালব

*সাইলিসিয়া	সিস্টাস ক্যানাডেন	স্পঞ্জিয়া
*সালফার	স্যাঙ্গুইনেরিয়া	স্ট্যানাম
		টিউবারকুলিনাম
		বোভিনাম

উপর্যুক্ত *তারকাচিহ্নিত ঔষধগুলি টিউবারকুলার-দোষগ্রস্ত রোগীতে ব্যবহার করবার সময় যথেষ্ট সাবধানতার দরকার। যেখানে রোগের প্রাখর্য বর্তমান অথবা রোগী নিজে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ (sensitive) সেখানে উহাদের প্রয়োগ করা উচিত উপযুক্ত শক্তিতে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার পর। বিকশিত সোরার জটিলাবস্থা ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে ; সেটি হচ্ছে সাধারণ। বিকশিত-সোরা যখন সাধারণ অবস্থায় থাকে, তখন তা আরোগ্য করা যায় সহজেই। সোরার লক্ষণাদির বিশেষ বিস্তৃতি বা গভীরতা দৃষ্ট হয় না এক্ষেত্রে। সোরার বিকশিত সাধারণ অবস্থায়, প্রকৃতপক্ষে চিররোগের প্রাথমিক বিকাশের সময়ে, তার চিকিৎসার প্রতি রোগীরা অবহেলা করে প্রায়ই। ফলে সেটি নানান জটিলতার ভিতর দিয়ে, রোগীর জীবনশক্তির তথা স্বাস্থ্যের ক্ষয়-ক্ষতি আনয়ন করে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। অতএব এখান থেকেই আমাদের উচিত হচ্ছে রোগী চিকিৎসার সুরু করা। তবেই সাফল্যলাভ হবে সুনিশ্চিত। ঔষধ-বাছাই-এর মূল নীতিটির প্রয়োগেই হচ্ছে এখানে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ঔষধ-বাছাই করার সময় এখানে আমরা সাহায্য নিতে পারি, আমাদের পূর্ববর্ণিত গাণিতিক পদ্ধতিটির।

সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসের ঔষধ-বাছাই-প্রণালীটির কথা মোটামুটি যা বললাম, তা ছাড়া আর একটি বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক। সেটি হচ্ছে উক্ত দোষাধীন রোগীদের constitution বা কাঠামো বিষয়ে। এই কাঠামোটি হচ্ছে রোগীর প্রকৃত পরিচায়ক। একই সোরা, সিফিলিস বা সাইকোসিস দোষপ্রাপ্ত রোগীদের কাঠামো হতে পারে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু আমাদের ঔষধ-বাছাই-এর বেলা কাঠামোটিকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে, যার ফলে রোগীর গভীরতম প্রদেশে আঘাতের দ্বারা আরোগ্য-ক্রিয়াকে করা যাবে সহজতর।

কাঠামোটিকে ঔষধ-বাছাই-এর ক্ষেত্রে কেমনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তারই আভাস দেবো যৎসামান্য। আমরা জানি যে, প্রায় ক্ষেত্রেই রোগীর কাঠামোটি গড়ে ওঠে, হয় রোগীর দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মগত হিসাবে। যেমন ক্যাল্কেরিয়া কার্বের রোগী হবে, অপরিপুষ্ট অস্থিসহ মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস ফরসা চেহারার; এটি তার জন্মগত কাঠামো। কিন্তু ফসের যে কাঠামো—লম্বা, পাতলা, শীঘ্র বেড়ে ওঠা ইত্যাদি—সেটি হচ্ছে রোগীর দৈনিক বৃদ্ধির অনুপাতে গঠিত। এমনিতরোভাবে প্রায় প্রত্যেক প্রধান ঔষধেরই একটি বিশিষ্ট কাঠামো আছে, যেটি রোগীর সঙ্গে মিললে ঔষধ-বাছাই-এর দিক দিয়ে সুবিধা হয়ে ওঠে অনেকখানি। ঔষধনির্ণয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এক কাঠামো অন্তর্গত রোগীতে যেন সেই কাঠামোর ঔষধ অধ্যারোপ করা হয়। তবেই হবে রোগীর আরোগ্যকরী

চিকিৎসা। কোন একটি শিশুরোগীতে কাঠামোটি ছিল ক্যাল্কে-কার্বের। কিন্তু সদৃশবিধান মতে চিকিৎসার খেয়ালে জনৈক ডাক্তার, তার উদরাময় পীড়ায় সেটিকে অবহেলা করেন। ফলে, ঔষধ দেওয়া হল যথেষ্ট, কিন্তু রোগীর উপকার দৃষ্ট হল না তদনুরূপ। অথচ সেখানে লক্ষণের আপাত সদৃশতার অভাবেও কাঠামোটির উপর দৃষ্টি রেখে জনৈক অভিজ্ঞ, দূরদর্শী চিকিৎসক রোগীকে আরোগ্য করলেন ক্যাল্কে-কার্ব প্রয়োগে। তাই বলছিলাম যে, কাঠামোটির দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। নচেৎ ঠিক সময়ে সঠিক ঔষধটি খুঁজে পাওয়া হয় একটু কষ্টসাধ্য। ঔষধ-বাছাই-এর ক্ষেত্রে কাঠামো বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করেও উপর্যুক্ত তথ্যটি মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। তবেই তো সম্ভব হবে নিরর্থক নিষ্ফলতার হাত এড়ানো।

সপ্তম অধ্যায়

সহচর-লক্ষণের নীতি

এতক্ষণ পর্যন্ত চিররোগীদের বেলায় ঔষধ-বাছাই এর সহজ কয়েকটি প্রণালীর উল্লেখ করেছি মাত্র। হয়তো, তাতে অনেক জটিল রোগী আরোগ্যের ক্ষেত্রে একটা বিজ্ঞানোচিত পন্থা অনুসরণের সুবিধা হবে অনেকের। শুধু তাই নয়, হ্যানিম্যান-নির্দেশিত অচিরে এবং চিরকালের জন্যে রোগারোগ্য করাও হবে সম্ভব। চিররোগী আরোগ্যের দ্বারা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র এবং উৎকৃষ্টতাই শুধু প্রমাণিত হয় না, হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিকতার একটা অনুদ্ঘাটিত পথও, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক-মহলের সামনে উদঘাটিত হয়ে পড়ে।

চিররোগী আরোগ্য করা হচ্ছে সময় সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট জটিলব্যাপার। এ ক্ষেত্রে সফলতালাভ করতে হলে সুষ্ঠুভাবে রোগীলিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। রোগীলিপি প্রস্তুতকরণের পর—লক্ষণসমূহের একটি নির্দিষ্ট ঔষধ-নির্বাচক ছক্ তৈরি করে ফেলে উক্ত রোগীর জন্য সর্বাপেক্ষা সদৃশ-ঔষধটি বাছাই করা কর্তব্য। লক্ষণের বিচার করার কাজে আমাদের সতর্ক হওয়া এবং যথেষ্ট দক্ষতার দরকার। তবেই তো হবে সঠিক ঔষধটি আমাদের হস্তগত।

কিন্তু অচিররোগীতে ঔষধ-বাছাই-এর ভূমিকাটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের; যেহেতু, অচিররোগীর সঙ্গে চিররোগীর

সম্পর্কটাও একটু বিভিন্ন রকমের। আমরা জানি যে, অচির-রোগের আক্রমণ অতি আকস্মিক এবং নিবৃত্তিও ঘটে দ্রুততর তালে, হয় জীবনের ইতি ঘটিয়ে, নয় আরোগ্যের মধ্যে দিয়ে। কাজেই, চিররোগী চিকিৎসার বেলায় আমরা যে দীর্ঘ সময়ের সদ্ব্যবহার করে থাকি, অচিররোগীর ক্ষেত্রে তার অপ্রতুলতা ঘটে যথেষ্ট। সেই কারণে, অচিররোগী চিকিৎসার পন্থা হিসাবেও একটা দ্রুততর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্তব্য; নচেৎ, বিফলতা আসাই স্বাভাবিক। এ ছাড়া, আর একটা কথা আছে। চিররোগের মূলে থাকে ধাতুগত দোষের এক বা একাধিক সংমিশ্রণের জটিল অবস্থা। জটের পর জট ছাড়িয়ে চলতে হয় সেখানে—তাই দীর্ঘ সময় এবং অধ্যবসায় আবশ্যক। কিন্তু অচিররোগ হলো, প্রকৃতপক্ষে সোরার সাময়িক বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশের মূলে প্রায়শই কোন না কোন, এক বা একাধিক উত্তেজক কারণ থাকে। যাই হোক, সোরার এই সাময়িক জাগরণকে ঘুম-পাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া চিকিৎসকের অন্য কোন কৌশলের দরকার নেই। সোরার এই হঠাৎ জেগে-ওঠা অবস্থাটিকে চিররোগ চিকিৎসার ধারায় আরোগ্য করতে গেলে রোগীকে হারাতে হতে পারে; কারণ, এ সব ক্ষেত্রে রোগটি প্রায়ই হয় মারাত্মক। এখানে স্বল্প সময়ের মধ্যে রোগের আক্রমণ বন্ধ করতে না পারলে, রোগীর মৃত্যু ঘটে অচিরকাল মধ্যে। তাই, আমরা অচিররোগী চিকিৎসার বেলায় ঔষধ-বাছাই-এর ক্ষেত্রে একটি দ্রুত অথচ নিশ্চিত-পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হই; এবং

এই সকল অচিররোগীতে সফলতা অর্জন করার ফলেই, হোমিওপ্যাথির প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে।

অচিররোগী চিকিৎসার পূর্বে, রোগ-লক্ষণসমূহ সঞ্চয় করা একান্তভাবে কর্তব্য। এই লক্ষণ-সংগ্রহের সময় থেকেই, আমাদের একটি বিশেষ ধরনের technique বা কৌশল অবলম্বন করতে হয় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। সঠিকভাবে রোগী পর্যবেক্ষণের মধ্যেই শতকরা ৭০ ভাগ সাফল্য লুকিয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে রোগীদর্শনের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। দর্শন অর্থে শুধু রোগীর subjective ও objective লক্ষণ সঞ্চয়ই নয়, তৎসহ আর একটু বেশী পর্যবেক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে পর্যবেক্ষণ কথাটাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োগ। লক্ষণ-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের আর একটা বাড়তি কাজ করতে হয়। সেটা হচ্ছে—রোগ-লক্ষণসমূহের মানসিক-বিশ্লেষণ। চিকিৎসক প্রত্যেকটি লক্ষণকেই এমনভাবে যাচাই করবেন, যাতে সে লক্ষণটি সম্পূর্ণাঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পায়। প্রত্যেক লক্ষণই যতক্ষণ না সম্পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি রোগীর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনের বা ঔষধ নির্বাচনের সাহায্য করে না। এই সম্পূর্ণাঙ্গ রূপটি পেতে হলে, অচিররোগীর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্লেষণ কাজটি করতে হয় মনে মনে। কালি-কলমের সাহায্য নেওয়ার মত সময় আমরা এক্ষেত্রে পাই না। তাই চিকিৎসকের মন ও দৃষ্টি হওয়া চাই বিশ্লেষণভঙ্গী। এমনিভাবে প্রত্যেকটি লক্ষণকেই সম্পূর্ণাঙ্গের কোঠায় আনলেই, আমরা totality of symptoms বা লক্ষণাবলীর সামগ্রিকতাটি পেয়ে থাকি;

লাক্ষণিক-সামগ্রিকতা সংগ্রহ করাই হচ্ছে ঔষধ-বাছাই-এর পূর্বাবস্থা।

প্রত্যেক লক্ষণকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতে হলে, আমাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ—

(১) অবস্থান বা location

(২) অনুভূতি বা sensation

(৩) হ্রাসবৃদ্ধির অবস্থা বা condition of aggravation and amelioration

লক্ষণের মধ্যে সাধারণত উক্ত ত্রয়ী অবস্থার বিষয়ে আমাদের সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকা দরকার ; এবং প্রত্যেকটি লক্ষণ-সঞ্চয়ের বেলায়, রোগীকে ঐ তিনটি অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করে সদুত্তর লাভ করতে হবে। রোগী অনেকক্ষেত্রে প্রায় নিজের থেকেই, উক্ত লক্ষণের অবস্থান-অনুভূতি ও হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে সদুত্তর দিয়ে থাকে ; যে সকল রোগী এ বিষয়ে কোন হদিশ দেয় না,—সেই সব রোগীর ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলির প্রকৃত পরিচয় প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এক্ষণে, আমরা লক্ষণ-বিশ্লেষণের প্রকৃষ্ট পন্থাটিকে কেমনভাবে অনুসরণ করবো তারই কথা বলবো। প্রত্যেকটি লক্ষণের হয় একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে, নয় দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। নির্দিষ্ট অবস্থানের ক্ষেত্রে লক্ষণটি কোন একটি অঙ্গ-বিশেষ জুড়ে তার অবস্থান জানিয়ে দেয় ; আমরা যার নাম দিতে পারি—আঙ্গিক-অবস্থান। এবং যে-ক্ষেত্রে রোগ-লক্ষণ কোন একটি অঙ্গ-বিশেষে না হয়ে প্রায় দেহের সর্বত্র জুড়ে থাকে ; আমরা

তাকে বলবো—সর্বাঙ্গিক-অবস্থান। আঙ্গিক বা সর্বাঙ্গিক অবস্থান প্রকৃত পক্ষে রোগীর একটি বিশেষ অবস্থা সূচিত করে মাত্র। আঙ্গিক-অবস্থানের লক্ষণটি অঙ্গ-বিশেষের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, সেটি উক্ত অঙ্গের একচেটিয়া অবস্থা নয়, পরন্তু সমস্ত দেহ ও মনের অসুস্থতার পরিচায়ক। তফাৎ কেবল তার আত্মপ্রকাশের স্তরে। সর্বাঙ্গিক-অবস্থানের সঙ্গে আঙ্গিক-অবস্থানের তফাৎ কেবলমাত্র স্তরের।

কোন একটি লক্ষণের আঙ্গিক-অবস্থান, বোধক্ষম রোগী-মাত্রই প্রকাশ করতে পারে। কারণ, উক্ত বিশেষ অঙ্গটি সম্বন্ধে সে সাধারণ সুস্থাবস্থায় সচেতন ছিল না রোগাবস্থায় কিন্তু যথেষ্ট সচেতন হয়ে পড়ে। তবু, রোগের যন্ত্রণা প্রদাহ বা লক্ষণ বিকৃতি থেকে সচেতন হয়ে উঠে, সে বুঝতে পারে যে তার—নির্দিষ্ট-অঙ্গের একটা রূপান্তর ঘটেছে। সাধারণত আমাদের হাত-পা-মাথা কিংবা পায়ের কড়ে আঙ্গুলটি বা নাকের ডগাটি অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঙ্গের সম্বন্ধে আমরা ভাবি না যে, অমুক অঙ্গটি অমুক স্থানে অবস্থান করছে, এমন কী উক্ত অঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা প্রায়ই সচেতন থাকি না। কিন্তু কোন একটি অঙ্গে যদি একটা ফোড়া, ব্যথা বা অসাড়তা (যথা—অনামিকাতে আঙ্গুলহাড়া বা নাকের ডগাতে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রণ অথবা জিহ্বার অসাড়তা) আসে তবে তৎক্ষণাৎ আমরা অনামিকা-অঙ্গুলি, নাকের ডগা অথবা জিহ্বা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি যথেষ্ট; উক্ত অঙ্গের

কোন একপ্রকার বিকৃতি-বিষয়ে অবহিত হই, আমরা রোগের আঙ্গিক-অবস্থান সম্বন্ধে অভিযোগ করি।

লক্ষণকোষ বা রেপার্টরি নামক পুস্তকে আমরা ভূরি ভূরি আঙ্গিক-অবস্থানের লক্ষণ দেখতে পাই। বহুতর উদাহরণের সাহায্যে লক্ষণের আঙ্গিকরূপটিকে চেনবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, বলে মনে করি না। বরঞ্চ, আঙ্গিক-অবস্থানের যে কয়েকটি স্তর আছে, তার কথা বলা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

অঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, দেহকে কয়েকটি anatomical order-এ বা শারীর-তাত্ত্বিক-বিন্যাসে ভাগ করা যেতে পারে ; সেগুলি হচ্ছে এই যে—

১। চর্ম বা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি
২। চর্বি-স্তর
৩। পেশী
৪। রক্ত
৫। স্নায়ু
৬। অস্থি এবং
৭। যন্ত্রাদি (বা viscera)

উক্ত স্তরের যে কোন একটিতে অথবা কয়েকটিতে রোগের আঙ্গিক-প্রকাশ দেখা যেতে পারে। যত গভীর স্তরে লক্ষণের আবির্ভাব হবে, ততই গুরুত্বপূর্ণ হবে সেই লক্ষণের অবস্থান। যন্ত্রাদির লক্ষণ যেরূপ গুরুতর আকারে দেখা দেয়, চর্মাঙ্গে অবস্থিত-লক্ষণ তার তুলনায় ততখানি গুরুতর হয় না।

লক্ষণের সম্পূর্ণাঙ্গতার দিক দিয়ে, এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে। কারণ, ঔষধ-বাছাই-এর বেলা, রোগলক্ষণের আঙ্গিক-অবস্থানের গুরুত্ব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আঙ্গিক অবস্থানের anatomical দিক ছাড়া, আর একটা দিক আছে, সেটি হচ্ছে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের রোগলক্ষণের অবস্থা। রোগলক্ষণ মোটামুটিভাবে হয় অন্তরঙ্গে অর্থাৎ চর্মচক্ষুর দৃষ্টির বাইরে দেহের অভ্যন্তরে প্রকাশ পাবে, নয় বহিরঙ্গে অর্থাৎ যা আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্যের মধ্যে দেখা দেবে। যকৃৎ-এর উপর যে ফোড়া বা রক্তের মধ্যে যে রোগজনিত পরিবর্তন ঘটে, তা হচ্ছে অন্তরঙ্গের অবস্থিতিসূচক লক্ষণ। আঙ্গুলহাড়া, দাদ, খোস, চুলকানি ইত্যাদি হল বহিরঙ্গের অবস্থিতিজ্ঞাপক লক্ষণ। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গের লক্ষণের গুরুত্ব বেশী।

এবার সর্বাঙ্গিক-অবস্থান লক্ষণ বলতে কী বোঝা যায়, তারই একটু আভাস দেবো। যে সকল লক্ষণ দেহের সর্বস্তর জুড়ে বিদ্যমান থাকে ;—তারাই হলো সর্বাঙ্গিক-লক্ষণ। কোন একটি অঙ্গবিশেষে লক্ষণটি সীমাবদ্ধ নয়। এদের উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ—

দেহের সর্বত্র ব্যথাভাব—আর্নিকা, ব্যাপ্টি, রাস-ট।

সর্বাঙ্গিক গাত্রদাহ—আর্সে, সালফ।

উদ্ভেদ বহির্গমন—বেলে, সালফ, আর্নিকা, রাস-ট, হিপার-সা, মার্ক-স, থুজা ইত্যাদি।

শীত-তাপ-ঘর্ম সাধারণত চর্মের লক্ষণ বলেই ধরা হয়,

কিন্তু রোগীর সর্বাঙ্গে এর আত্মপ্রকাশ বলে, অনেক সময়েই এদেরও সর্বাঙ্গিক-অবস্থানের পর্যায়ে ফেলা হয়।

আঙ্গিক ও সর্বাঙ্গিক অবস্থার মধ্যে এই কথাটিই হলো উল্লেখযোগ্য ;—সর্বাঙ্গিক লক্ষণ আঙ্গিক-লক্ষণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। যাই হোক, ঔষধ-বাছাই-এর বেলা লক্ষণের অবস্থানটিকে লক্ষ্য করা হয়, লক্ষণের সম্পূর্ণাঙ্গ রূপলাভের প্রথম পাদ মাত্র হিসাবে।

প্রত্যেক লক্ষণের মধ্যে অবস্থানের পর অনুভূতি হচ্ছে তার দ্বিতীয় পাদ। প্রত্যেক লক্ষণেরই একটা বিশিষ্ট অনুভূতি থাকে। অনুভূতির মাধ্যমে আমরা লক্ষণের ক্রিয়াকাণ্ডের সন্ধান পাই, আমাদের ঔষধ-বাছাই-এর যা হচ্ছে একটি মূল্যবান পরিচায়ক অবস্থা। লক্ষণের অবস্থান বলতে যদি anatomical অস্তিত্বের কথা বুঝি, তবে অনুভূতি বলতে বুঝবো যে, লক্ষণের বিকৃত physiological অস্তিত্ব। অনুভূতির মাধ্যমেই আমরা সময়ে সময়ে anatomical অস্তিত্বের হদিশ পাই। অনুভূতি হচ্ছে, এমন একটা বিকৃতি physiological অবস্থা, যা রোগীর দেহের কোন একটা অংশের ব্যথা-বেদনার অস্তিত্ব জানায়। সুস্থ অবস্থায় আমরা কোন অঙ্গের বিকৃত physiological ক্রিয়ার পরিচয় পাই না। রোগীর কোন একটি ফোড়ায় যে বেদনা হয় তা হচ্ছে উক্ত স্থানের বিকৃত অনুভূতির পরিচায়ক। কোথাও যদি কন্‌কনানি, ঝন্‌ঝনানি অথবা অন্য কোন প্রকার অস্বাভাবিক অনুভূতি দেখা দেয়, তবে সে সমস্ত হলো—লক্ষণের আনুভৌতিক অবস্থা। প্রত্যেক

লক্ষণেরই কোন একটা অনুভূতি আমরা পাই—এটি রোগী-দেহে অথবা মেটিরিয়া মেডিকার ঔষধে, উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বিরাজ করে। উভয়ের সাদৃশ্যগত মিলনের ফলেই ঔষধ-বাছাই-এর কাজটি হয় সম্পাদিত। রোগীদেহে এবং ঔষধে যদি অনুভূতির পার্থক্য ঘটে, তবে সে ঔষধটি কখনই কার্যকরী হয় না।

অনুভূতির উদাহরণমালায় আমরা কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করতে পারি, যাদের ঔষধগুলি রেপার্টরি সাহায্যে খুঁজে বের করা যায় অনায়াসে। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলে দিই। অনুভূতিও অবস্থানের মতই আঙ্গিক ও সর্বাঙ্গিক পর্যায়ে পড়তে পারে। কারণ, লক্ষণের ব্যাপ্তি হিসাবেই অনুভূতির ব্যাপ্তি।

অনুভূতি নানা ধরনের হতে পারে। যদি কোন অঙ্গে বেদনা বা যন্ত্রণা হয়, তবে সেটি মোচড়ানো, কাটাছেঁড়া, ছুঁচফোটানো, হুলবেঁধা, চাপ দেওয়া, ঘিন্‌ঘিনে ইত্যাদি। উক্ত বেদনা একস্থানে অবস্থান করে, অথবা একদিক থেকে অন্যদিকে চলে বেড়ায় কিংবা বিদ্যুতের মত চিড়িক মারে কি না—তারও খোঁজ নিতে হবে। বেদনার প্রকারভেদ অন্য ধরনেরও হতে পারে কখনও কখনও। যেমন, জ্বালাকর, শৈত্যবাহী অথবা উষ্ণভাবাপন্ন। এছাড়া অনুভূতির আরও রকমফের বর্তমান। শরীরের কোনস্থানের স্পর্শাধিক্যতা বা তাহার বৈপরীত্যভাব অর্থাৎ স্পর্শরাহিত্যও অনুভূতির অন্তর্গত। তা ছাড়া আরও কতকগুলি অদ্ভুত-অদ্ভুত অনুভূতিও দেখা দেয়

সময়ে-সময়ে। মাথাটা বৃহৎ মনে হওয়া অথবা মাথার ভিতরে শূন্যবোধ কিংবা পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ-জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার অনুভূতি'। এ সব দৈহিক-সম্পর্কযুক্ত অনুভূতি ব্যতীত মানসিক-স্তরের যে সমস্ত অনুভূতি থাকে, তার আলোচনা এখানে আর করলাম না। সে যাই হোক, প্রত্যেক লক্ষণের অবস্থানের পর তার বিশিষ্ট অনুভূতির খোঁজ লওয়া একান্ত-প্রয়োজন।

লক্ষণের তৃতীয়-পাদ হলো তার হ্রাসবৃদ্ধি। হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে লক্ষণের এমন একটি অবস্থা, যা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে,—লক্ষণটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। রোগ-লক্ষণ কিসে বাড়ে বা কমে, এটি না জানলে লক্ষণের আসল পরিচয়ই থাকে লুক্কায়িত।

প্রত্যেক লক্ষণেরই প্রায় এক বা একাধিক হ্রাসবৃদ্ধি জাত অবস্থা থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে থাকে এদের নিকট সম্বন্ধ। দেহের কোন একটি যন্ত্রণা চাপে উপশম অথবা বৃদ্ধি কিংবা গরমে হ্রাস এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি বা তদ্বিপরীত অবস্থা। তাই প্রত্যেক লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির অবস্থাটি যাচাই করে নিতে হয় নানাভাবে। ঔষধ-বাছাই-এর বেলা হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষণটি প্রকৃত-চুম্বকের কাজ করে; অর্থাৎ ঔষধ থেকে ঔষধান্তরের প্রভেদ নির্দেশক লক্ষণ হল উক্ত হ্রাসবৃদ্ধি। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—কলোসিন্থ ও ডায়াস্কোরিয়ার পেটবেদনা। বেদনায় তীব্রতা উভয়ের প্রায় একইরূপ। এ ক্ষেত্রে, উক্ত লক্ষণটির ঔষধ-বাছাই-এর কষ্টিপাথর হলো,

বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি। কলোসিন্থের বেদনা>চাপে; কিন্তু ডায়াস্কোরিয়ার হচ্ছে তার বিপরীত> টানটান করলে। কিংবা ধরা যাক 'হাঁটুর বাতে'—ব্রাইওনিয়া ও রাস টক্স। বাতের বেদনার তীব্রতা, ফোলা ও অন্যান্য অবস্থা থেকে উভয়ের পার্থক্যের বিশেষ কোন হদিশ মিলবে না, ঔষধ-বাছাই-এর সময়। এ ক্ষেত্রে ঔষধ বাছাই-এর বা পার্থক্যকরণের উপায় হলো, হ্রাসবৃদ্ধির তুলনামূলক যাচাই। ব্রাইওনিয়ার> বিশ্রামে ও <নড়াচড়ায় এবং রাস টক্স—প্রথমে নড়াচড়ায় বৃদ্ধি কিন্তু খানিকক্ষণ পরে যন্ত্রণার উপশম। এ সব ক্ষেত্রে লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি না জেনে ঔষধ-বাছাই করা প্রায় অসম্ভব।

হ্রাসবৃদ্ধির প্রকারভেদ আছে নানান রকমের। কয়েকটি লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়। কয়েকটি বা ঋতু-পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলে যথানিয়মে। শৈত্য-তাপ প্রয়োগে, নড়াচড়ায় বা বিশ্রামে, চাপে বা মৃদু-স্পর্শে, অথবা হাঁটা-দৌড়ে, কথা-বলায়, কিংবা নিদ্রা-জাগরণে,—ইত্যাকার নানাবস্থার মধ্যে রোগীর লক্ষণটিকে যাচাই করতে হয়। এ অবস্থাগুলিকেই আমরা পারিপার্শ্বিক-অবস্থা বলতে চেয়েছি। এই হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা হয়েছে; কাজেই, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হচ্ছে নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনায় আর একটা বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। রোগীর কিসে উপচয়-উপশম হয়, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে, এটিও খেয়াল রাখা দরকার যে, উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে ঔষধজ অথবা রোগজ। ঔষধজ বৃদ্ধি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। একে

যেন লক্ষণের সাধারণ বৃদ্ধি বলে ভুল না করি। সেইজন্য, এক্ষেত্রে আমাদের মোটামুটি জেনে রাখা উচিত যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কতটুকু :—

ঔষধজ-বৃদ্ধি	রোগজ-বৃদ্ধি
১। হয়তো কয়েকটি স্থানীয় লক্ষণ বা বাহ্য-লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা দেবে, কিন্তু রোগী ব্যাপক-ক্ষেত্রে বোধ করবে আরাম।	১। স্থানীয়-লক্ষণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক-ক্ষেত্রে রোগী অস্বচ্ছন্দতা-বোধ করবে, এমন কী, ব্যাপক লক্ষণাবলীও বেড়ে চলবে উত্তরোত্তর।
২। স্বল্পকালস্থায়ী—	২। দীর্ঘকালস্থায়ী—
চিররোগে—বৃদ্ধিকাল চলতে থাকে ৭, ১৪, ২০ দিন অথবা খুব বেশী হলে এক বা একাধিক মাস পর্যন্ত।	চিররোগে—বৃদ্ধি উত্তরোত্তর মৃত্যুকাল পর্যন্ত চলতেই থাকে—যদি না ইতিমধ্যে উপযুক্ত ঔষধে তার নিবৃত্তি করা যায়।
অচিররোগে—আধঘণ্টা, এক বা একাধিক ঘণ্টা ধরে বৃদ্ধিকাল স্থায়ী হয়; ক্বচিৎ এক বা একাধিক দিন ধরেও চলতে পারে।	অচিররোগে—ভয়ানক হলে একমাত্র মৃত্যু মাঝেই তার অবসান হয়; কিংবা রোগের প্রকোপ যেখানে প্রচণ্ড নয়, সেখানে ধীরে ধীরে আরোগ্য-লাভও সম্ভব।
৩। দৈহিক লক্ষণের বৃদ্ধি হলেও মানসিক-লক্ষণের হ্রাস হয় সর্বাগ্রে।	৩। মানসিক ও দৈহিক লক্ষণের বৃদ্ধি হয় প্রায় একই সময়ে।
৪। ঔষধজ বৃদ্ধি ভাসা-ভাসা লক্ষণের স্তরে। ভিতরের যন্ত্রের বা অপরিহার্য অঙ্গে যে সব লক্ষণ বিরাজমান, তার হয় উন্নতি।	৪। সর্বস্তরেই বৃদ্ধি লক্ষ্য হয়, অপরিহার্য যন্ত্রেরও ক্ষতিসাধন করে যথেষ্টভাবে।

লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপের উপর ঔষধ-বাছাই ও শক্তি-নির্ণয় নির্ভর করে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষণের সময়ও আমাদের হ্রাসবৃদ্ধির লক্ষণাবলীকে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে সঞ্চয় করতে হয় ;—তবেই আমরা পাই ঔষধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

এক্ষণে লক্ষণের তিনটি অবস্থা জানবার পর, আমরা লক্ষণের সম্পূর্ণাঙ্গ-রূপটির আভাস পেয়ে থাকি ; অচিররোগীর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকা একান্ত দরকার। লক্ষণগুলির তিনটি অবস্থার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির অবস্থাটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ; মূল্যের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে—অনুভূতির ; এবং অবস্থানের মূল্যমান হচ্ছে তৃতীয় স্থানে। কাজেই, প্রত্যেক লক্ষণের সম্পূর্ণাঙ্গ অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে, যখন লক্ষণাবলী সংগ্রহ করা হয়, তখন দেখতে পাই যে—কয়েকটি লক্ষণ রোগীর বিবরণীতে প্রায়ই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অসম্পূর্ণতার ফাঁকটা কোথাও অবস্থানের ক্ষেত্রে, আর কোথাও অনুভূতির আবার কখনও বা হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এ ফাঁকের অংশ শত প্রশ্ন করেও আর ভরিয়ে তোলা যায় না। তাই, প্রত্যেকটি লক্ষণের সম্পূর্ণাঙ্গ অবস্থা নেবার চেষ্টার পর দেখতে হয়, কোথায় কোথায় ফাঁক পড়ছে। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মূল্যমানের উপর লক্ষণের গুরুত্ব আসে। যে যে লক্ষণ হয় সম্পূর্ণাঙ্গ, সেই সেই লক্ষণ-নির্দেশক ঔষধগুলির প্রাধান্য সর্ব-প্রথম। পরে লাক্ষণিক মূল্যমানের ক্রমের উপর অন্যান্য লক্ষণের স্থান হয় নির্দিষ্ট ; এদের মধ্যে যে ঔষধ কয়টি সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের মধ্যে মিলবে এবং অন্যান্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

অবস্থা নির্দেশকারী বেশীর ভাগ লক্ষণের তালিকায় পাওয়া যাবে, সেই ঔষধ কয়টিই হচ্ছে, উক্ত অচিররোগের পক্ষে সর্বাধিক বিবেচ্য। সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ ব্যতীত বাকি লক্ষণাবলীর নাম সহচর লক্ষণ (concomitants) দিয়াছেন, হ্যানিন্যানের সমসাময়িক ডাঃ বোনিংহোসেন। এবং উক্ত প্রণালীতে ঔষধ-বাছাই-এর যে সোজা নীতি, তাকে বলেছেন—doctrine of concomitants বা সহচর-লক্ষণের নীতি। কারণ, সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের-তালিকায় বহু ঔষধের নাম থাকে, তাদের বাছাই হয় সহচর-লক্ষণের মধ্যে যে ঔষধটি বেশীবার পাওয়া যায় তার উপর। প্রকৃতপক্ষে, সহচর-লক্ষণগুলি ঔষধ-বাছাই-এর কাজটি সমাধা করেছে এক্ষেত্রে।

আমরা এবারে সম্পূর্ণাঙ্গ-লক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ রেপার্টরির পাতা থেকে তুলে দিয়ে বিষয়টিকে আরও একটু স্বচ্ছ করবার চেষ্টা করছি—

হৃদ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ধক্‌ধকানি<অল্প নড়াচড়ায়—অ্যাক্টিয়া-রে, ডিজি।

মাথাব্যথা, পূর্ণতাবোধ ও ভারবোধ, যেন মাথার সামনে কেউ 'ইস্ক্রুপ' এঁটে দিচ্ছে,>চাপে ও শক্ত করে বাঁধলে—আর্জে-না, এপিস, পালস।

যে কোন ভাবেই রোগী শুয়ে থাক না কেন, যে অংশটি বিছানার সংস্পর্শে থাকে, তাতেই টাটানি-ব্যথা অনুভব করে,>নাড়াচড়ায়—ব্যাপ্টি, পাইরো।

বুকে ছুঁচ-ফোটার মত যন্ত্রণা, রাত্রে বৃদ্ধি,<নড়াচড়ায়,

নিঃশ্বাস লওয়ায়, কাশলে, > পূর্ণ বিশ্রামে, যন্ত্রণার অংশে চাপ দিয়ে শুলে—ব্রাইও, পালস।

কেলি বাইক্রমিকামেও ছুঁচ-ফোটার মতো ব্যথা বিদ্যমান কিন্তু < ও > বিপরীতার্থক।

মূত্রনালীতে জ্বালাকর কাটা-ছেঁড়ার মতো বেদনা, < বিশেষত প্রস্রাবের সময়—ক্যান্থারিস।

গলাধরা, চাঁছানি বেদনা সহ ও স্বরলোপ, < প্রাতে—কস্টি (< সন্ধ্যায়—কার্বো-ভে, ফস।)

মাথাঘোরা, বিশেষত যখন শুয়ে থাকে অথবা মাথা একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে যাওয়ার সময়, বিশেষত বাঁ-দিকে ঘোরবার সময় বৃদ্ধি—কোনিয়াম।

পেটে অধিক বায়ুর সঞ্চার, ক্ষুধা ভালোই, কিন্তু অল্প অল্প খেলেই গলা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে যায়; ঢেকুর উঠলেও আরাম হয় না—লাইকো।

মাসিক কেবলমাত্র রাত্রিতে অথবা শুয়ে থাকার সময়; চলাচল করলেই বন্ধ হয়ে যায়—ম্যাগ-কা, অ্যামন-মিউর, ক্রিয়োজোট।

পাকস্থলীতে পাথরের মত চাপবোধ, < খাবারের ১।২ ঘণ্টা পরে—নাক্স-ভ (খাবারের অব্যবহিত পরেই—কেলি বাই, নাক্স-ম) ইত্যাদি।

এমনিতরো বহু লক্ষণ মেটিরিয়া মেডিকা ও রেপার্টরিতে আছে, যেগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এ ধরনের লক্ষণ ব্যতীত সহচর (concomitant)

লক্ষণগুলিও, ঔষধের পার্থক্য নির্দেশের পক্ষে অনেকাংশে কার্যকরী। সহচর-লক্ষণের নীতিতে অচিররোগীর ঔষধ-বাছাই করা যেমন সহজ, চিররোগীর ক্ষেত্রে ততখানি নয়; অবশ্য চির-রোগীতেও এই প্রণালীটি খুবই লাগসৈ। কিন্তু আমরা সাধারণত অচিররোগীর ক্ষেত্রেই উক্ত নীতিটিকে কাজে লাগাই। সময়ের অল্পতা হেতু এই প্রণালীটিতে সহজেই ঔষধ বাছাই করতে পারা যায় নির্ভুলভাবে। এখানে একটি রোগী-তত্ত্বের সাহায্যে উক্ত প্রণালীটির কার্যকরী প্রয়োগ দেখানো হচ্ছে। উদাহরণে অচিররোগীর বিষয়েই বলা হচ্ছে—

একটি চব্বিশ বছরের যুবক হচ্ছে এই রোগী; আমরা রোগীকে দেখতে গিয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি লক্ষণ সংগ্রহ করি ঃ— রোগীর গলায় অত্যন্ত বেদনা, যেন গলায় কাঁটা ফুটছে ও জ্বালাভাব। ঢোঁক গিলতে বা কিছু খেতে গেলেই বেদনার বৃদ্ধি; গরম জল পান করলে আরাম। সকালে ও নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জল পানে বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধভাব। একলা থাকতে ভয় পায়। সামান্য জ্বর আসে সন্ধ্যার দিকে। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস লয়; নাকের মধ্যে মামড়িতে ভর্তি। প্রস্রাব কড়া ধরনের।

উক্ত রোগীর লক্ষণাবলীকে আমরা সাজিয়ে নিলাম, তাদের অবস্থান-অনুভূতি-হ্রাসবৃদ্ধি ও সহচর-লক্ষণের বিভাগ-অনুযায়ী ঃ—

১। আঙ্গিক অবস্থান—গলায়, পৃঃ ৪৬৯ (কেন্টের রেপার্টরি দ্রষ্টব্য) নাক, পৃঃ ৩৪১

২। অনুভূতি—কাঁটা ফোটার মতো বেদনা, পৃঃ ৪৭৫
জ্বালাভাব, পৃঃ ৪৭১

৩। হ্রাসবৃদ্ধি—<ঢোঁক গিলবার সময়, পৃঃ ৪৭০
<আহারকালীন, পৃঃ ৪৭০
<প্রাতে, পৃঃ ৪৬৯
<জাগরিত হবার পর, পৃঃ ৪৭০
<শীতল পানে, পৃঃ ৪৭০
>উষ্ণ পানে, পৃঃ ৪৭০
একলা থাকতে ভয়, পৃঃ ৫৩

৪। সহচর-লক্ষণ—সন্ধ্যাকালে জ্বর আসে, পৃঃ ১২৯২
মুখে নিঃশ্বাস লয়, পৃঃ ৪২০
নাকের ভিতরে মামড়ি, পৃঃ ৩৪১
কড়া প্রস্রাব, পৃঃ ৬৯৭
কোষ্ঠবদ্ধ, পৃঃ ৬১৭

লক্ষণকোষের মাধ্যমে লক্ষণের মূল্য নির্ধারণ করে দেখা গেল যে—লাইকো ১০।২১, ল্যাকে ১০।২০, হিপার ১১।১৯, সালফ ৯।১৯, রাস টক্স ৮।১৮, অ্যালুমি ৮।১৬, আর্স ৮।১৫, ক্যাল্কে-কা ৮।১২, বেলে ৭।১৫, কেলি-কা ৭।১৫, আর্জে-না ৭।১৪, এপিস ৭।১৩, মার্ক ৭।১২, ফস ৭।১২ ইত্যাকারে ঔষধের তালিকা সূচিত করে।

আমরা এখানে দেখছি যে, লাইকো, ল্যাকে, হিপার, সালফ, রাস টক্স, আর্সে ইত্যাদি কয়েকটি ঔষধ উক্ত রোগীর কয়েকটি লক্ষণাবলী (অবস্থান, অনুভূতি ও হ্রাসবৃদ্ধি) নিয়ে,

এক একটি সম্পূর্ণাঙ্গ-লক্ষণের group বা শ্রেণী নির্দেশ করছে। যথা—

লাইকো—শ্রেণীর লক্ষণাবলী

গলায় বেদনা (অবস্থান)
<প্রাতে (হ্রাসবৃদ্ধি)
জ্বালাভাব (অনুভূতি)
<শীতল পানে
>উষ্ণ পানে } (হ্রাসবৃদ্ধি)
<জাগরিত হলে

জ্বর সন্ধ্যাকালে,
মুখে নিঃশ্বাস লয়,
নাকের মধ্যে মামড়ি,
একলা থাকতে ভয়, } (সহচর-লক্ষণ)
কড়া প্রস্রাব
কোষ্ঠবদ্ধ

ল্যাকেসিস—শ্রেণীর লক্ষণাবলী

গলায়
নাকে } (অবস্থান)

জ্বালাভাব (অনুভূতি)
<ঢোঁক গিলবার সময়,
<প্রাতে } (হ্রাসবৃদ্ধি)
<জাগরিত হলে

জ্বর সন্ধ্যাকালে
মুখে নিঃশ্বাস লয় } (সহচর-লক্ষণ)

নাকের মধ্যে মামড়ি
কড়া প্রস্রাব } (সহচর-লক্ষণ)

হিপার সালফ—শ্রেণীর লক্ষণাবলী

গলায়
নাকে } (অবস্থান)

কাঁটাফোটার মত বেদনা
জ্বালাভাব } (অনুভূতি)

<ঢোঁক গিলবার সময়
>উষ্ণ পানে } (হ্রাসবৃদ্ধি)

জ্বর সন্ধ্যাকালে
মুখে নিঃশ্বাস লয়
নাকের মধ্যে মামড়ি } (সহচর-লক্ষণ)
একলা থাকতে ভয়

সালফার—শ্রেণীর লক্ষণাবলী

গলায়
নাকে } (অবস্থান)

জ্বালাভাব (অনুভূতি)

<ঢোঁক গিলবার সময় (হ্রাসবৃদ্ধি)

জ্বর সন্ধ্যাকালে
মুখে নিঃশ্বাস লয়
নাকের মধ্যে মামড়ি
কড়া প্রস্রাব
} (সহচর-লক্ষণ)

ইত্যাকারে প্রায় আরো কয়েকটি ঔষধই সম্পূর্ণাঙ্গ-লক্ষণের অজুহাতে অংশত রোগ-আরোগ্য করবার ক্ষমতা রাখে। পর পর ২।৩টি ঔষধ দিয়ে রোগীকে আরাম করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সহচর-লক্ষণের নীতি অনুযায়ী যদি প্রথমেই প্রকৃত সদৃশতম (বা similimum) ঔষধটি বাছাই করে দেওয়া হয়, তবে ১টি মাত্র ঔষধে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব হয়। সেই কারণে সহচর-লক্ষণের সাহায্য নেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

আমরা এখানে সহচর-লক্ষণাবলীর প্রায় সব কটিতেই লাইকোর আভাস পাচ্ছি। অবশ্য, এখানে লাইকো ও ল্যাকেসিসের মধ্যে সদৃশতম (similimum) ও সদৃশের (similar) পার্থক্য আছে, কাজেই সদৃশতম ঔষধটি বাছাই-এর দিকে ঝোঁক হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া সম্পূর্ণাঙ্গ-লক্ষণের ক্ষেত্রেও—প্রথম শ্রেণীর (অর্থাৎ, হ্রাসবৃদ্ধি) লক্ষণের সংখ্যাও সর্বাধিক। লক্ষণের মূল্যমান, ও সহচর-লক্ষণের আধিক্যে লাইকোপোডিয়ামই হচ্ছে উক্ত রোগীর প্রকৃত similimum. রোগীকে আমরা লাইকো ৩০ একমাত্রা দিই যার ফলে, রোগীটি আরোগ্যলাভ করে অচিরকাল মধ্যে।

অষ্টম অধ্যায়

কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ-বাছাই

অচিররোগীতে ঔষধ-বাছাই করতে হলে সচরাচর যে নীতি হয় সময়োপযোগী, সহজসাধ্য এবং কার্যকরী, তাদের আলোচনা করার পর, আর একভাবে ঔষধ-নির্ণয়ের আভাস দেবার ক্ষেত্র হলো এই। অচিররোগ উৎপাদনের মূলে সময়ে সময়ে এক বা একাধিক উত্তেজক কারণ থাকে, যা অনেক সময়েই স্বল্পায়াসে ঔষধ-বাছাই-এর নির্দেশ দেয়, আমাদের বাঁধাধরা প্রণালীতে না গিয়েও। রোগের কারণাবলী নির্দেশক এমন কয়েকটি ঔষধ আছে, যা সময়মতো প্রয়োগ করতে পারলে, রোগলক্ষণাবলীর সাদৃশ্য খোঁজার বিরাট পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচা যায়। স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যে অদ্ভুত কার্যকারিতা দেখিয়ে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন, সে কেবল এই রোগীর কারণতত্ত্বের উপর নজর রেখে সঠিক ঔষধ বাছাই করেছিলেন বলে। ডাঃ সরকার তখন গোঁড়া অ্যালোপ্যাথ; রাজেন্দ্রলাল তাঁকে হোমিওপ্যাথিতে দীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় ডাঃ সরকারের জনৈক আত্মীয়ের ভয়ানক colic বেদনার সূত্রপাত হয়। ডাঃ সরকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্যকারিতা যাচাই করবার প্রকৃত-ক্ষেত্র হিসাবে, এই কলিক বেদনা আরোগ্য করবার জন্য দত্ত

মহাশয়কে ডাক দেন। দত্ত মহাশয় যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে রোগীর তত্ত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু যখন তিনি রোগের কারণতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, তখন জানলেন যে, বর্তমান কলিকের সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, রোগী কর্তৃক মাংস-আহার। ডাঃ দত্ত এই মাংসাহারকেই একমাত্র কারণ অবলম্বন করে, পালসেটিলা দিয়ে রোগীকে আরোগ্য করে অতি শীঘ্র ঘুম পাড়িয়ে দেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল হন বিস্মিত এবং ঔষধের কার্যকারিতায় হন মুগ্ধ।

আমার এ উদাহরণ দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র কারণের উপর নির্ভর করে, ঔষধ-বাছাই করা চলে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে। কিন্তু, প্রশ্ন হতে পারে যে, কারণ-তত্ত্বের উপর সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বেশী দেওয়া হবে অথবা অন্যান্য লক্ষণাবলীর উপর? একটিমাত্র সদুত্তর দেওয়া যেতে পারে এখানে। রোগের কারণ যেখানে সুস্পষ্ট এবং ঔষধ-নির্দেশক, —সেখানে কারণাশ্রয়ী ঔষধ-বাছাই করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য উক্ত ঔষধটির মধ্যেও কারণগত লক্ষণটি যদি যথেষ্ট স্পষ্টীকৃত থাকে, তবেই। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে রোগের কারণটি হবে ভাসা-ভাসা, সেখানে উক্ত কারণের উপর নির্ভর করে ঔষধ নির্বাচন করা হবে হঠকারিতার পরিচয়। এখানে অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য-যুক্ত ঔষধ-বাছাই করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেখানে কারণের অস্বচ্ছতা থাকে না, সেখানে কারণাশ্রয়ী ঔষধ দিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার এবং রোগের যন্ত্রণা দূর করা, চিকিৎসকের বিজ্ঞতার নিদর্শন।

ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের রোগীতে মাংসাহারের ফলে কলিক-বেদনার সূত্রপাত—এখানে কারণটি ছিল সুস্পষ্ট। সেই জন্য উক্ত কারণের উপর নির্ভর করে পালস দেওয়া বিজ্ঞোচিতই হয়েছে।

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল, আমার একটি রোগী-চিকিৎসায়, যেখানে কারণকে অবহেলা করে, রোগী-লক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। রোগীটির বহুরকমের জটিল-লক্ষণাদি ছিল,—যা এখানে উল্লেখ না করলেও, বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। তবে রোগের যা কিছু লক্ষণাবলীই রোগীকে টিকা দেওয়ার পরই আরম্ভ হয়। এটি জেনেছিলাম, কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিই নি এর। বহু ঔষধ প্রয়োগে বিফল মনোরথ হবার পর, রোগিলিপিটি পুনরায় যখন মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলাম—তখন উক্ত টিকা দেওয়ার ঘটনাটি মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে উঠলো; দেখলাম, যা কিছু গোলমালের সৃষ্টি এর পরেই। আমি এবার নতুনভাবে ঔষধ-বাছাই-এর দিকে মনোযোগ দিলাম। উক্ত রোগীটিতে অ্যান্টিম-টার্ট নির্বাচন ও প্রয়োগ করে আশাতীত ফললাভ করেছিলাম সেদিন।

চিররোগীর-ক্ষেত্রে কারণতত্ত্বের উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই। চিররোগের মূল কারণ হচ্ছে তিনটি—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। এসব রোগীর চিকিৎসার্থে কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তার আলোচনা করেছি পূর্বাপর-পরিচ্ছেদে।

কারণকে অনেকে হ্রাসবৃদ্ধির পর্যায়ে ধরেন। ডাঃ বোনিং-

হোসেন হচ্ছেন সেই শ্রেণীর। কিন্তু ডাঃ ন্যাশ প্রমুখ চিকিৎসক-বৃন্দ কারণকে পৃথক রাখার কথাই বলেছেন। আমরাও এক্ষেত্রে ডাঃ ন্যাশেরই পক্ষপাতী। কেন না, প্রকৃতপক্ষে কারণ থেকেই হয় রোগের সূত্রপাত, সেই কারণ বিদূরিত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণাবলীও হয় নিশ্চিহ্ন। যে-কারণটি রোগোৎপাদনে সহায়তা করে, আমরা তাদের উত্তেজক-কারণের অন্তর্ভুক্ত করি। এ ছাড়া কারণের আর একটা গোষ্ঠী আছে, যাদের বলা হয় স্থায়ী-কারণ। স্থায়ী-কারণ রোগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেয়। এটি যতদিন বিদ্যমান থাকে ততদিন রোগের গতি নিরুদ্ধ হয় না। এই গোষ্ঠীটাকে অবশ্য 'হ্রাস-বৃদ্ধি'র বেড়াজালে ধরা যেতে পারে অনেকখানি। সেই হেতু ঔষধ-নির্বাচনের পূর্বে স্থায়ী-কারণকে, রোগীর পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে, যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া দরকার। নচেৎ, স্থায়ী-আরোগ্যলাভ করা হবে প্রায় অসম্ভব।

কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ-বাছাই-এর ক্ষেত্র স্বল্প হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে অমোঘ। তাই, কারণতত্ত্বের অনুসন্ধানের বেলায়, কারণটি কোন্ শ্রেণীতে পড়ে—উত্তেজক বা স্থায়ী—সেটি দেখে নিয়ে, তদনুসারে কাজ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আমরা এখানে উভয়তরো কারণের কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ ও তাদের ঔষধের তালিকা দেবো, যার ফলে কারণতত্ত্বের আলোচনা হবে সুপরিস্ফুট এবং ঔষধ-বাছাই-এর ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে।—

আঘাত-জনিত-পীড়াদি (মানসিক ও দৈহিক):—
অ্যাকোন, অ্যামন, কস্টি, হাইড্রো-অ্যাসি, ইপি, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স, নাক্স-ম, ওপি, ফস, সিকেল, স্ট্রনসি, ট্যাবে, ভিরেট্রা, আর্নিকা, আর্স, ক্যালেডি, ক্যাম্ফর, ক্যাপ্সিকা, কার্বো-ভে, ক্যামো, চায়না, কফি, কুপ্রাম, ডিজি, জেলসি, হাইপেরি, হিপার।

আহার ও পানীয় হেতু:—

অম্লযুক্ত (acid) পদার্থ সেবন হেতু:—১। আর্স, অ্যাকোন, কার্বো-ভে, হিপা, সিপি। ২। অ্যান্টিম ক্রু, নাক্স, নেট্রাম-মি, ফস, ফস-অ্যাসি, ফেরা, ল্যাকে, সালফ-অ্যাসি।

আহারের অল্প পরে প্রত্যেক খাদ্যই পীড়াদায়ক হয়:—১। কার্বো-ভে, ক্যাল্কে-কার্ব, চায়না, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, সালফ। ২। আর্স, অ্যামন, কোনি, গ্র্যাফা, ক্যালমি, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-কা, পালস, পেট্রো, ফস, ফস-অ্যাসি, ব্রাইও, লাইকো, সাইক্লা, সাইলি, সিপি, রাস।

আহারের পর, কিঞ্চিৎকাল উপশম-বোধ:—অ্যানাকার্ডি, চেলিডো, পেট্রো, লিলিয়াম।

আহারের পর, পেট-জ্বালার সঙ্গে ক্ষুধা:—আর্জেন্ট-নাই, অ্যালাম, বোভি, লাইকো, স্ট্রনসি।

আহারের পর ক্ষুধা ও তৎসহ উদরে শূন্যভাব:—ক্যাল্কে, ক্যাম্ফর, গ্র্যাফা, চায়না, লরোসিরে, সিনা।

উদর-স্ফীতি, স্ফীতিকারক পদার্থ খাওয়া হেতু:—১। কার্বো-ভে, চায়না, নাক্স-ভ। ২। কুপ্রা, পালস, পেট্রো, ব্রাইও, ভিরেট্রাম, লাইকো।

গোল-আলু-খাওয়া হেতু ঃ—অ্যামন, অ্যালাম, পালস, ভিরেট্রা, সিপি।

গোল-মরীচ, ইত্যাদি মশলা খাওয়া হেতু ঃ—আর্স, চায়না, নাক্স, সিনা।

চর্বি বা চর্বিযুক্ত খাদ্য হেতু ঃ—১। আর্স, কার্বো-ভে, চায়না, থুজা, নেট্রাম-মি, পালস, ট্যারাক্সা, সিপি। ২। কলচি, নাইট্রি-অ্যাসি, ফেরা, ম্যাগ্নেসি, সাইক্লা, হেলিবো।

জলপান হেতু ঃ—১। চায়না, পালস, মার্ক, সালফ-অ্যাসি, রাস। ২। আর্স, ক্যাপ্সি, ক্যামো, নাক্স-ভ, নেট্রাম, ফেরা, ভিরেট্রা।

ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী বা গুগ্‌লী খাইলে যে রোগ, কিংবা উক্ত প্রাণীদ্বয়ের কোন একটি খাইয়া, তারপর দুধ খাইলে যে উৎকট পীড়া হয় ঃ—পালস।

ডিম খাওয়ার হেতু ঃ—কলচি, পালস, ফেরা।

তরমুজ খাওয়ার হেতু ঃ—জিঙ্ক।

তামাক খাওয়া হেতু ঃ—১। নাক্স-ভ, পালস। ২। ইগ্নে, স্পঞ্জি, স্ট্যাফি। ৩। আর্নিকা, অ্যাকোন, অ্যান্টিম ক্রু, ইউফ্রে, ইপি, ককু, কুপ্রা, কলোসি, ক্যামো, ক্লিমেটিস, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, ফস, ব্রাইও, ভিরেট্রা, মার্ক।

দুগ্ধপান হেতু ঃ—১। ব্রাইও, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ। ২। ইগ্নে, অ্যাম্বা, কার্বো-ভে, কুপ্রা, কোনি, ক্যালমি, চায়না, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, পালস, ফস, ম্যাগ-কা, লাইকো, ল্যাকে, সালফ-অ্যাসি, রাস।

পচা-মৎস্য হেতু ঃ—১। কার্বো-ভে, পালস। ২। চায়না, রাস।

পলাণ্ডু খাওয়া হেতু ঃ—থুজ্য, নাক্স-ভ।

পিষ্টক-ইত্যাদি খাওয়া হেতু ঃ—১। পালস, ব্রাইও। ২। আর্স, কার্বো-ভে, ক্যালমি, ভিরেট্রা, লাইকো।

ফল ইত্যাদি খাওয়া হেতু ঃ—১। আর্স, পালস, ব্রাইও, ভিরেট্রা। ২। চায়না, নেট্রাম-মি, মার্ক, ম্যাগ-মি, সিপি, সেলিনি।

বরফ খাওয়া হেতু ঃ—আর্স, কার্বো-ভে, পালস।

বাছুরের মাংস খাওয়া হেতু ঃ—ইপি, কষ্টি, ক্যাল্কে-কা, সিপি।

বিয়ার নামক মদ্য পান হেতু ঃ—১। আর্স, কলোসি, নাক্স-ভ, পালস, ফেরা, বেলে, সালফ, সিপি, রাস। ২। ইগ্নে, অ্যালাম, অ্যাসারাম, মেজে, মিউর-অ্যাসি, ভিরেট্রা, স্ট্যানাম।

বিষাক্ত শামুক বা ঝিনুক জাতীয় দ্রব্য আহারে ঃ—ইউফরবি, কার্বো-ভে, লাইকো, রাস।

ব্রাণ্ডি খাওয়া হেতু ঃ—১। ওপি, নাক্স-ভ। ২। ইগ্নে, আর্স, ককু, ক্যাল্কে, ভিরেট্রা, লিডাম, ল্যাকে, সালফ, স্ট্র্যামো, হিপার।

মদ্যপান হেতু—১। আর্স, ওপি, কফি, ক্যাল্কে, জিঙ্কাম, নাক্স-ভ, ল্যাকে, সাইলি। ২। আর্নি, অ্যান্টিম ক্রু, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, পালস, সালফ, সিপি।

মৎস্য খাওয়ার ফলে ঃ—কার্বো অ্যানি, ক্যালমিয়া, প্লাম্বাম।

মাখন খাওয়া হেতু ঃ—আর্স, কার্বো-ভে, চায়না, নাইট্রি-অ্যাসি, পালস, সিপি, হিপার।

মাংস খাওয়া হেতু ঃ—কস্টি, ক্যাল্কে-কা, পালস, ফেরাম, মার্ক, রুটা, সাইলি, সালফ্, সিপি।

মিষ্ট জিনিস খাওয়া হেতু ঃ—ইগ্নে, অ্যাকোন, ক্যামো, গ্র্যাফা, জিঙ্ক, মার্ক, সেলিনি।

রুটি সহ্য না হলে ঃ—১। কস্টি, চায়না, নেট্রাম-কা, পালস, ফস-অ্যাসি, ব্যারাই-কা, ব্রাইও, মার্ক, লাইকো, সিপি, স্ট্যাফি, রাস। ২। কফি, ক্যালমি, জিঙ্ক, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, ফস, সালফ, সিনা।

লবণযুক্ত পদার্থ সেবন হেতু ঃ—আর্স, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, ড্রসি, লাইকো।

লিমোনেড পান হেতু ঃ—সেলিনি।

সসেজ (sausage) নামক মাংস-পাক নষ্ট হয়ে গেলে, তা খেলে যে পীড়া হয় ঃ—আর্স, ফস-অ্যাসি, বেলে, ব্রাইও, রাস।

স্পিরিট জাতীয় পদার্থ হেতু ঃ—১। ওপি, আর্স, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ, পালস, সালফ, হাইও, হেলেবো। ২। ইগ্নে, অ্যান্টিম ক্রু, কফি, চায়না, চেলিডো, নাক্স-ম, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, বেলে, মার্ক, ভিরেট্রা, লাইকো, লিডাম, সাইলি, সেলিনি, স্ট্র্যামোনি, রাস।

শূকরের মাংস খাওয়া হেতু ঃ—কলচি, কার্বো-ভে, ড্রসি, নেট্রাম-মি, পালস, সিপি।

উত্তাপজনিত পীড়া ঃ—

শারীরিক পরিশ্রম, সূর্যোত্তাপ ও অগ্ন্যুত্তাপ ইত্যাদির মধ্যে থাকার ফলে পীড়া হলে ঃ—১। আর্নি, অ্যাকোন, এমিল নাই, অ্যান্টিম ক্রু, ওপি, কার্বো-ভে, ক্যাক্টাস, ক্যাম্পি, ক্যাম্ফর, গ্লোনইন, জিঙ্ক, থুজা, থেরিডি, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, বেলে, ব্যাপ্টি, ব্রাইও, ভিরেট্রা-ভি, ল্যাকে, সাইলি।

জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার ঃ—

জননেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুণ পীড়া ঃ—১। ক্যাল্কে, চায়না, ফস-অ্যাসি, নাক্স-ভ, সালফ, স্ট্যাফি। ২। আর্নি, অ্যানাকার্ডি, কার্বো-ভে, নেট্রাম-মি, ফস, মার্ক, সিপি। ৩। আর্স, অ্যাগারি, কোনি, থুজা, নেট্রাম-কা, পালস, পেট্রো, সাইলি, সিনা, স্পাইজি।

হস্ত-মৈথুন হেতু ঃ—১। নাক্স-ভ, সালফা। ২। ককু, কার্বো-ভে, কোনি, ক্যাল্কে, চায়না, নেট্রাম-মি, ফস-অ্যাসি, স্ট্যাফি। ৩। অ্যানাকার্ডি, অ্যান্টিম ক্রু, ডাল্কা, পালস, পেট্রো, লাইকো, মার্ক, সাইলি, সিনা, সিপি, স্পাইজি।

চর্মোদ্ভেদজনিত পীড়াদি ও ক্ষরণ বন্ধ হওয়া জনিত পীড়া ঃ—

অর্শ বসিয়া গেলে ঃ—১। অ্যাকোন, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ, পালস, সালফ। ২। আর্স, ইগ্নে, অ্যামন-মি, অ্যাম্বা, অ্যান্টিম ক্রু, কলোসি, কস্টি, ক্যাম্পি, ক্যালমি, গ্র্যাফা, চায়না, নাইট্রি-অ্যাসি, পেট্রো, বেলে, মিউরি-অ্যাসি, ল্যাকে, সালফ, সিপি, রাস।

ঘর্ম বসিয়া গেলে ঃ—১। ক্যামো, চায়না, ডাল্কা, বেলে, ব্রাইও, ল্যাকে, সাইলি, সালফ। ২। আর্স, অ্যাকোন, ওপি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, পালস, ফস, মার্ক, লাইকো, সিপি, রাস।

চর্মোদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া হেতু পীড়া (স্বাভাবিকভাবে) ঃ—১। অ্যাকোন, ক্যাল্কে-কা, চায়না, নাক্স-ভ, পালস, বেলে, ব্রাইও, লাইকো, সালফ। ২। আর্স, কস্টি, কার্বো-ভে, ক্যামো, গ্র্যাফা, ডাল্কা, ফস, ফস-অ্যাসি, লাইকো, সাইলি, সিপি, স্ট্র্যামো, রাস। ৩। অরাম, আর্নি, ইগ্নে, ইপি, অ্যামন, অ্যান্টিম ক্রু, অ্যান্থ্রা, ককু, কুপ্রা, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, নাক্স-ভ, ব্যারাই, মার্ক, মিউরে-অ্যাসি, র‍্যানান, সিনা, সেনেগা, স্পঞ্জি, হাইও, হিপার।

চর্মোদ্ভেদ বসে যাওয়া হেতু পীড়া (আঘাতাদি হতে) ঃ—১। আর্নি, কোনি, পালস, ল্যাকে, সালফ-অ্যাসি, সিকু, হিপার, রাস। ২। ইউফ্রে, অ্যাকোন, অ্যামন, কস্টি, ক্যামো, ক্যাল্কে, জিঙ্ক, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, ফস, রুটা, সাইলি, সালফ, স্ট্র্যামো। ৩। আইওড, অ্যালাম, কার্বো-ভে, ডাল্কা, পেট্রো, বেলে, বোরাক্স, সাইলি।

চর্মোদ্ভেদ বসে যাওয়া হেতু পীড়া (জলে দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে) ঃ—১। ক্যাল্কে-কা, পালস, নাক্স-ম, সালফ, সার্সা। ২। অ্যামোনি, অ্যান্টিম ক্রু, কার্বো-ভে, ডাল্কা, নাইট্রি-অ্যাসি, বেলে, মার্ক, সিপি, স্পাইজি, রাস।

চর্মোদ্ভেদ বসে যাওয়া হেতু পীড়া (ঠাণ্ডা লাগা হেতু) ঃ—

১। অ্যাকোন, কফি, ক্যামো, ডাল্কা, নাক্স-ভ, পালস, মার্ক, সালফ। ২। আর্স, ইপিকা, কার্বো-ভে, ফস, বেলে, ব্রাইও, সাইলি, স্পাইজি, হাইও, রাস। ৩। কলোসি, কোনি, ক্যাল্কে-কা, গ্র্যাফা, চায়না, নাই-অ্যা, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, ভিরেট্রা, ম্যাগ্নে, লাইকো, সিপি, স্যাম্বু, হিপার।

পদের ঘর্ম বসে গেলে ঃ—১। কুপ্রা, নাইট্রি-অ্যাসি, পালস, সাইলি, সিপি। ২। ক্যামো, নেট্রাম-মি, মার্ক।

পুঁজ নিঃসরণ ও ক্ষতবন্ধ হয়ে গেলে ঃ—১। বেলে, ল্যাকে, সাইলি, সালফ, হিপার। ২। আর্স, কার্বো-ভে, নেট্রাম-মি, ফস-অ্যাসি, মার্ক, লাইকো, সিপি, স্ট্যাফি, রাস।

রক্তস্রাব রোধ হয়ে গেলে ঃ—১। অ্যাকোন, চায়না, নাক্স-ভ, পালস, ফেরা, বেলে, সালফ। ২। অরাম, আর্নিকা, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-মি, ফস, ব্রাইও, লাইকো, সাইলি, সিপি, সেনেগা, স্পঞ্জি, স্ট্র্যামো, হাইও।

লোকিয়া-স্রাব বন্ধ হয়ে গেলে ঃ—১। কলোসি, জিঙ্ক, নাক্স-ভ, প্ল্যাটি, ভিরেট্রাম, সিকেল, হাইও, রাস। ২। কোনি, ডাল্কা, পালস, বেলে, সালফ, সিপি।

স্তন্য-দুগ্ধ ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলে ঃ—১। ডাল্কা, পালস, বেলে, ব্রাইও। ২। অ্যাকোন, কফি, ক্যাল্কে, ক্যামো, মার্ক, সালফ, রাস।

স্ত্রীলোকের ঋতু বসে গেলে ঃ—১। অ্যাকোন, কোনি, ক্যালমি, ডাল্কা, পালস, ব্রাইও, লাইকো, সাইলি, সালফ, সিপি। ২। আর্স, আইওড, অ্যামন-মি, ওপি, ককু, কস্টি, ক্যামো,

ক্যাল্কে, কুপ্রা, চায়না, জিঙ্ক, প্ল্যাটি, ফস, ফেরাম, বেলে, ব্যারাই, মার্ক, নাক্স-ম, নাইটি-অ্যাসি, ভিরেট্রা, ভ্যালে, স্যাবাই, স্ট্যাফি, স্ট্র্যামো, রডো।

সর্দি ও অন্যান্য রসক্ষরণ বন্ধ হলে ঃ—১। আর্স, অ্যাকোন, ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, পালস, বেলে, ব্রাইও, সালফ, সিনা।

২। ইপি, অ্যামোন-মি, অ্যান্ট্রা, কার্বো-ভে, কোনি, ক্যালমি, গ্র্যাফা, ডাল্কা, নাই-অ্যাসি, নাক্স-ম, নেট্রাম-মি, ফস, লাইকো, রডো, সালফ, স্যাম্বু।

হার্পিস ও অন্যান্য চর্মোদ্ভেদ বসে গেলে ঃ—১। গ্র্যাফা, ডাল্কা, পালস, ফস-অ্যাসি, বেলে, ব্রাইও, সালফ, হিপার। ২। আর্স, অ্যাকোন, অ্যান্ট্রা, কস্টি, কার্বো-ভে, ক্যামো, থুজা, নেট্রাম-মি, মস্কাস, মার্ক, লাইকো, ল্যাকে, সাইলি, সার্সা, সিপি, স্ট্যাফি।

ঠাণ্ডা-লাগা বা সর্দি হওয়ার হেতু পীড়া ঃ—

গরমের পর ঠাণ্ডা লেগে পীড়া ঃ—অ্যাকো, ভিরেট্রা, মার্ক, রাস।

গ্রীষ্মে সর্দি লাগলে ঃ—কার্বো-ভে, ডাল্কা, বেলে, ব্রাইও।

ঠাণ্ডা লাগা স্বভাব হলে ঃ—১। কার্বো-ভে, কফি, ক্যাল্কে, ডাল্কা, নাক্স-ভ, পালস, বেলে, সাইলি, রাস। ২। ইগ্নে, অ্যাকোন, গ্র্যাফা, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, পেট্রো, ফস, বোরাক্স, ব্যারাই, মার্ক, ম্যাগ-মি, লাইকো, সালফ, স্পাইজি, হাইও।

ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘর্ম বসে গেলে ঃ—আর্স, অ্যাকোন, ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, পালস, ল্যাকে, সালফ।

ঠাণ্ডা লাগার দরুণ রজোনিঃসরণের গোলযোগ হলে ঃ—অ্যাকোন, ক্যাল্কে, চায়না, ডাল্কা, পালস, বেলে, সাইলি, সালফ, সিপি।

ঠাণ্ডা বা গরম লেগে যে পীড়া ঃ—কার্বো-ভে, ল্যাকে, সালফ।

ঝড়—বাতাস অসহ্য হলে ঃ—ব্রাইও, সাইলি, রডো।

বসন্তে সর্দি লাগলে ঃ—কার্বো-ভে, ভিরেট্রা, ল্যাকে, রাস।

বায়ু পরিবর্তন সহ্য না হলে ঃ—কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, ডাল্কা, ভিরেট্রা, মার্ক, ল্যাকে, সাইলি, সালফ, রাস।

ভিজা ও শীতল বাতাস পীড়াদায়ক হলে ঃ—অ্যামন, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে-কা, ডাল্কা, ভিরেট্রা, বোরাক্স, রডো, রাস।

যে কোন প্রকার ঠাণ্ডা বাতাস হউক, সহ্য হয় না ঃ—আর্স, ককু, কস্টি, ক্যাপ্সি, ক্যাম্ফর, ক্যাল্কে, নাক্স-ম, বেলে, ব্যারাই, ডাল্কা, স্যাবাডি, হেলে, রডো, রাস।

শরতে, সর্দি লাগলে ঃ—(১) ডাল্কা, ভিরেট্রা, মার্ক, রাস। (২) ক্যাল্কে, চায়না, ব্রাইও।

সর্দি, অত্যন্ত ঘর্মের উপর ঠাণ্ডা লাগলে ঃ—অ্যাকোন, কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, চায়না, ডাল্কা, ফস-অ্যাসি, মার্ক, সিপি, রাস।

—, আর্দ্র শীতল বাতাস লেগে ঃ—ডাল্কা, ভিরেট্রা, রডো, রাস।

—, ঘর্ম বসে যাওয়ার দরুণ, কিংবা শারীরিক স্রাব হঠাৎ বন্ধ হওয়া হেতু ঃ—(১) ইপি, ব্রাইও। (২) আর্স,

অ্যাকোন, কার্বো-ভে, ক্যামো, ডাল্কা, ফস-অ্যাসি, মার্ক, রাস।

সর্দি, চরণ ভিজা হেতু ঃ—কুপ্রা, ক্যামো, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-মি, পালস, মার্ক, সাইলি, সিপি, রাস।

—, বরফ, ফল এবং টক ইত্যাদি আহার হেতু পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লেগে ঃ—আর্স, কার্বো-ভে, পালস।

—, বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে ভিজলে ঃ—(১) আস, ক্যাল্কে, ডাল্কা, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, সার্সা, রাস। (২) কলচি, কস্টি, ফস, বেলে, বোরাক্স, ব্রাইও, লাইকো, হিপার।

—, ভিজে যাওয়ার দরুন ঃ—১। ক্যাল্কে, ডাল্কা, পালস। ২। আর্স, কার্বো-ভে, নাক্স-ম, সার্সা, রাস। ৩। কলচি, কস্টি, ফস, বেলে, বোরাক্স, ব্রাইও, সিপি, লাইকো, হিপার।

সর্দি, মস্তক ভিজা হেতু ঃ—অ্যাকোন, পালস, বেলে, ব্রাইও, লিডাম, সিপি।

—, শীত লাগলে ঃ—১। ডাল্কা, ভিরেট্রা, মার্ক, রাস। ২। ক্যাল্কে, চায়না, ব্রাইও।

—, শীতল জলে গাত্র ধৌত কিংবা তন্মধ্যে থেকে কাজকর্ম করলে ঃ—১। ক্যাল্কে, নাক্স-ভ, পালস, সালফ। অ্যামন, অ্যান্টিম-ক্রু, কার্বো-ভে, ডাল্কা, নাইট্রি-অ্যাসি, বেলে, মার্ক, সিপি, স্পাই, রাস।

—, শীতল শুষ্ক বাতাস লাগলে ঃ—ইপি, অ্যাকোন, ক্যামো, নাক্স-ভ, বেলে, ব্রাইও, সালফ।

—, স্নান করা হেতু ঃ—১। অ্যান্টিম ক্রু, কার্বো-ভে,

ক্যাল্কে, সালফ। ২। আর্স, কস্টি, নাইট্রি-অ্যাসি, বেলে, সালফ, সার্সা, সিপি।

সর্দি কিংবা ঠাণ্ডা লাগা হেতু যে যে পীড়ার উৎপত্তি হয় তজ্জন্য ঃ – ১। অ্যাকোন, কফি, ক্যামো, ডাল্কা, নাক্স, পালস, মার্ক, সালফ। ২। আর্স, ইপি, কার্বো-ভে, ফস, বেলে, ব্রাইও, সাইলি, স্পাইজি, হাইও, রাস। ৩। কলোসি, কোনি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, চায়না, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ম, নেট্রাম-মি, ভিরেট্রা, ম্যাগ্নে, লাইকো, সালফ-অ্যাসি, সিপি, স্যাম্বু, লাইকো, হিপার।

সর্দি লাগা স্বভাব এরূপ যে, সামান্য একটু ঠাণ্ডা বাতাস, আবহাওয়ার পরিবর্তন, কিংবা একটু গরম ও তৎপরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেই পীড়া জন্মে ঃ—কার্বো-ভে, ক্যাল্কে-কা, ব্রাইও, ভিরেট্রা, মার্ক, লাইকো, ল্যাকে, সালফ।

সর্দি লাগা হেতু তরুণ এবং উৎকট বেদনা ঃ—আর্স, অ্যাকোন, কস্টি, ক্যামো, নাক্স-ভ, পালস, বেলে, মার্ক, স্পাইজি, স্যাম্বু।

সর্দি লাগা হেতু বেদনা মৃদু ও তরুণ হলে ঃ—ইপি, চায়না, ডাল্কা, নাক্স-ম।

সর্দি লাগা হেতু দুর্দমনীয় পুরাতন রোগে ঃ—কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, নাইট্রি-অ্যাসি, নেট্রাম-মি, ফস, ম্যাগ্নে, লাইকো, সালফ, সিপি, হিপার।

সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হলে ঃ—অ্যামন, কার্বো-ভে, নাইট্রি-অ্যাসি, মার্ক, সালফ।

নানাবিধ কারণ-জনিত পীড়া ঃ—

অত্যন্ত মাতালদিগের পীড়ায়ঃ—১। আর্স, ওপি, কফি, ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, পালস, বেলে, মার্ক, ল্যাকে, সালফ, হাইও, হেলে। ২। ইগ্নে, অ্যাগারি, অ্যান্টিম ক্রু, কার্বো-ভে, নেট্রাম-মি, ভিরেট্রা, রুটা, র‍্যানান, লাইকো, লিডাম, সাইলি, সালফ-অ্যাসি, স্পাইজি, স্ট্র্যামো।

গাড়ী কিংবা অন্য কোন যানে চড়িয়া গমন এবং দোলান হেতু পীড়া ঃ—১। আর্স, ককু, পেট্রো, সালফ। ২। কলচি, নাক্স-ম, ফেরাম, সাইলি, সিপি। ৩। ইগ্নে, কার্বো-ভে, কেলি, ক্রোকা, গ্র্যাফা, নেট্রাম-কা, প্ল্যাটি, ফস, বোরাক্স, সেলিনি, স্ট্যাফি, হিপার।

পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু ঃ—১। আর্নিকা, ইপি, অ্যান্টিম ক্রু, নাক্স, পালস। ২। আর্স, ইগ্নে, অ্যাকোন, কফি, কার্বো-ভে, চায়না, নেট্রাম-মি, ব্রাইও, স্ট্যাফি, হিপার। ৩। ক্যাল্কে, ক্যামো, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, ফস, ভিরেট্রা, সাইলি, সালফ, সিপি।

পাথরের ধূলিজনিত পীড়ায় ঃ—ক্যাল্কে-কা, নেট্রাম-মি, পালস, লাইকো, সাইলি, সালফ।

বিষযুক্ত কীটাদির দংশনে—লিডাম (একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)। আর্নিকা, অ্যাকোন, বেলে, মার্ক।

জিহ্বায় বোলতায় কামড়ালে ঃ—আর্নিকা, অ্যাকোন ; ফল না দর্শিলে বেলে ও পরে মার্ক।

চক্ষে কামড়ালে—আর্নিকা ও অ্যাকোন।

হাতে পায়ে বোলতায় কামড়ালে—চিনি।

ভ্রমণ করে দুর্বল হওয়া হেতু পীড়া ঃ—আর্নি, কফি, ক্যাল্কে, চায়না, থুজা, ফেরাম, ব্রাইও, ভিরেট্রা, রাস।

মাদক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায় ঃ—১। অ্যান্টিম ক্রু, নাক্স-ভ, সালফ। ২। ক্যাল্কে, চায়না, ডাল্কা, নাইট্রি-অ্যাসি, ফস, ফস-অ্যাসি, বেলে, ব্রাইও, রাস।

মানসিক উত্তেজনা বা মনের উদ্বেগ হেতু ঃ—১। ইগ্নে, অ্যাকোন, ওপি, কফি, কলোসি, ক্যামো, নাক্স-ভ, পালস, ফস-অ্যাসি, বেলে, ব্রাইও, ভিরেট্রা, মার্ক, ল্যাকে, স্ট্র্যামো, হাইও। ২। অরাম, আর্স, কফি, কস্টি, ক্যাল্কে, নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, লাইকো, সালফ, সিপি।

মানসিক শ্রম হেতু ঃ—১। ক্যাল্কে-কা, নাক্স-ভ, পালস, বেলে, ল্যাকে, সালফ। ২। অরাম, আর্নি, ইগ্নে, অ্যানাকা, ওলিয়েণ্ডার, ককু, কলচি, নেট্রাম-মি, প্ল্যাটি, লাইকো, সিপি, স্যাবাডি।

শারীরিক পরিশ্রম হেতু পীড়া ঃ—১। আর্নি, অ্যাকোন, ককু, কফি, ক্যাল্কে, চায়না, ব্রাইও, ভিরেট্রা, মার্ক, সাইলি, রাস। ২। অ্যালাম, নাক্স-ভ, নেট্রাম-মি, রুটা, লাইকো, সালফ, স্যাবাইনা।

শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগা হেতু ঃ—১। আর্নি, কোনি, ব্রাইও, সিকু, স্পাইজি। ২। ইগ্নে, অ্যাকোন, ক্যাল্কে, নাক্স-ভ, ফস-অ্যাসি, বেলে, রুটা, সালফ, সিনা, হিপার, রাস।

রক্ত ও অন্যান্য জীবন-রক্ষক জলীয়-পদার্থের অতিরিক্ত স্রাব

হেতু পীড়ায় ঃ—১। কার্বো-ভে, ক্যাল্কে, চায়না, নাক্স-ভ, ফস-অ্যাসি, ভিরেট্রা, ল্যাকে, সালফ, সিনা। ২। আর্স, ইগ্নে, কোনি, নেট্রাম-মি, পালস, ফেরা, মার্ক, সাইলি, সিপি, স্পাইজি, স্কুইলা, স্ট্যাফি।

উপর্যুক্ত লক্ষণকোষটির সাহায্যে আমরা রোগের কারণ অনুসারে ঔষধ বাছাই করতে পারি। উক্ত কারণসমূহের সকলই উত্তেজক কারণের মধ্যে পড়ে। এখানে স্থায়ী কারণগুলির কথা বলা হয় নি। স্থায়ী কারণাবলী হচ্ছে—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। অচির-রোগের বেশীর ভাগই হচ্ছে সুপ্ত সোরার অস্থায়ী আত্মপ্রকাশ মাত্র। কোন্ কোন্ ঔষধ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসের দোষঘ্ন তার কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলেছি ; কাজেই, এক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করি না।

———

নবম অধ্যায়

মারী-ঔষধতত্ত্ব

অচিররোগে ঔষধ-বাছাই বিষয়ে আর একটি কথা বলা দরকার; অচিররোগের যে কয় রকমের প্রকারভেদ আছে তাদের ঔষধ-বাছাই-এর আভাস দেওয়া হয়েছে পূর্বের পরিচ্ছেদ কয়টিতে। রোগ-মাত্রই ব্যক্তিবিশেষের জৈব-বিকৃতি। তাই হোমিওপ্যাথিতে individualisation বা ব্যষ্টিকরণের এত প্রাধান্য। এবং সেই কারণেই হ্যোমিওপ্যাথিতে রোগীর অস্তিত্ব স্বীকৃত, রোগের নয়। ওটি হল ব্যষ্টিগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ ছাড়াও একটি সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেটি সময়ে সময়ে বহু রোগীতে আত্মপ্রকাশ করে প্রায় একই কালে। প্রায় একই রকম লক্ষণাক্রান্ত-রোগে বহু জনে প্রায় একই প্রকার দুর্ভোগ ভোগে। এমনিতরো সমষ্টিগত আক্রমণের নাম মহামারী বা epidemic রোগ। এক বা একাধিক বিশিষ্ট-উত্তেজক কারণের ফলেই, সমষ্টিগত রোগের প্রাদুর্ভাব। মহামারী রোগ প্রায় একই সময়ে বহু লোকের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক রোগীর মধ্যে অনেকগুলি সদৃশাত্মক-লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রভাবে তাদের লক্ষণের একটু-আধটু রকমফের ঘটে মাত্র। এই কারণে, মহামারী-রোগ এক হলেও, রোগীর লক্ষণের তারতম্য থাকে তাদের মধ্যে। এই তারতম্যানুসারেই হয় ঔষধের বিভিন্নতা।

উক্ত রোগীসমূহের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুরকমের লক্ষণ। একটি হচ্ছে রোগের, অপরটি রোগীর। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ স্তরের এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অসাধারণ-লক্ষণ। সাধারণ লক্ষণগুলির সব রোগীতেই বিদ্যমান থাকে; কিন্তু অসাধারণ লক্ষণগুলি রোগীবিশেষে বর্তমান। প্রথম লক্ষণগুলির দ্বারা রোগীর ঔষধ-নির্বাচন করা যায় না, কিন্তু উক্ত রোগের জন্য একটি ঔষধতালিকা পাওয়া যায় মাত্র। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঔষধ-বাছাই-এর পক্ষে কার্যকরী। ওদের মধ্যেই থাকে রোগীর ঔষধ-নির্বাচনের আভাস। পৃথক-পৃথক রোগীর জন্য পৃথক-পৃথক ঔষধের নির্দেশ মিলে।

এ ছাড়া, এই সমস্তরোগীতে আর একটি সাম্যভাব লক্ষণীয়। আমরা যদি একই রোগান্তর্গত কয়েকটি রোগীর সমূহ লক্ষণ-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হই, তবে দেখতে পাই যে,—তাদের অসাধারণ-লক্ষণসমূহের সমষ্টিফল হয় একটি বা দুটি মাত্র ঔষধের বর্ণনা-জ্ঞাপক। অর্থাৎ, কোন একটি বা দুটি ঔষধের পূর্ণাঙ্গ চিত্রেরই অল্প-বিস্তর ভগ্নাংশের রূপ প্রতিফলিত থাকে উক্ত মহামারী-রোগীদের মধ্যে ছড়িয়ে। এক্ষেত্রে ঔষধ-বাছাই-এর মস্ত একটা সুবিধা পাই আমরা। আমরা যদি কয়েকটি রোগীর অসাধারণ-লক্ষণসমূহের সমষ্টিকে একই তালিকাভুক্ত করে নিই, তবে তার মধ্যে থেকে যে কয়টি ঔষধের চিত্র প্রতিফলিত হবে, তারই সাহায্যে উক্ত সময়ের যাবতীয় রোগীদের আরোগ্য করতে পারি। প্রথম-প্রথম যে পরিশ্রমটুকু করা যায়, তারই ফললাভ করি উত্তরকালের সমস্ত রোগীতে। অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে

হবে যে—প্রতি বৎসরই উক্ত মহামারী-রোগের (যদি প্রাদুর্ভাব হয়) সমষ্টিগত চিত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ বছরের ঔষধ-চিত্রগুলি পরবর্তী বৎসরের রোগী-চিত্রের সদৃশ না হতেও পারে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঔষধ-চিত্রের সাদৃশ্যও দেখা দিতে পারে। এই উপলব্ধিটুকু না থাকার জন্যই হ্যানিম্যানের সমসাময়িক চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। হ্যানিম্যান, সে সময়, genus epidemicus-এর তত্ত্ব বুঝিয়ে সে ভুল ভাঙ্গতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে ?

Genus epidemicus নির্ধারণ করাই হচ্ছে, মহামারী-রোগে ঔষধ-বাছাই-এর মূল মন্ত্র। কয়েকটি রোগীর অসাধারণ-লক্ষণসমূহকে একত্র করার পর, তাদের মধ্য দিয়ে কোন্ কোন্ ঔষধ আত্মপ্রকাশ করছে,—সেটিই হচ্ছে এক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয়। যে-যে ঔষধ-কয়টির চিত্রে রোগী-চিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে—সেগুলিই হবে উক্ত মহামারী-রোগের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ঔষধ। এখানে আর তখন নিখুঁত ব্যষ্টিকরণের বা individualisation-এর প্রয়োজন হয় না।

———

দশম অধ্যায়

প্রজ্ঞা-দর্শন

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদ কয়টিতে আমরা ঔষধ-বাছাই-এর যে কয়টি প্রণালীর আভাস দিয়েছি, সাধারণত সেগুলির সাহায্যেই অধিকাংশ চির ও অচির রোগী আরোগ্য করা যায়। এবং আমরা যদি উক্ত প্রণালীসমূহকে ক্ষেত্র-বিশেষে প্রয়োগ করি, তবে আরোগ্যকার্য যেমন নিশ্চিত ও দ্রুতভাবে সাধিত হয়, তেমনভাবে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে এখানে একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এই যে—আমরা যেন কোন মতেই routinist না হই; সর্বক্ষেত্রেই, প্রণালী-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ নিতে অবহেলা যেন না করি কোনমতেই। কারণ, চিকিৎসা-কার্যটি কোন একটি যান্ত্রিক-প্রণালী নয়; এটি হচ্ছে কেবলমাত্র বুদ্ধি বৃত্তির সহযোগে কয়েকটি সুষ্ঠু নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগের প্রণালী মাত্র। সেখানে স্বীয় বিচার-শক্তির সহায়তা লওয়া একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ, তবেই আমরা আরোগ্যকার্যে সর্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ করতে পারি।

এক্ষেত্রে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার; অতীত ও বর্তমান যুগের বহু কীর্তিধন্য প্রজ্ঞাবান চিকিৎসক অতি সহজে এবং অতি দ্রুতভাবে, রোগীর ঔষধ-বাছাই-এর পরিচয়

দিয়েছেন—যা অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অনেক সময় সাধারণ চিকিৎসকের বুদ্ধির দুরধিগম্য। এমন কী অনেক জটিল চির-রোগীতেও, তাঁরা অতি সহজেই ঔষধ-বাছাই করতে পারেন। এটি সম্ভব হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁদের মনে এমন একটা ক্ষমতা অর্জিত হয়, যার ফলে, তাঁরা বিশেষ কোন প্রণালী অনুসরণ না করেও ঔষধ-বাছাই করতে পারেন। এক্ষণে, আমরা এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেবো, যার ফলে তাঁদের ঔষধ-বাছাই রহস্যটি বা কৌশলটি হবে সুপরিস্ফুট। অতি দ্রুতভাবে ঔষধ-নির্বাচনের পিছনে থাকে তিনটি কারণের একত্র সমাবেশ ঃ—

১। রোগী পর্যবেক্ষণকালে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির একাগ্রতা এবং রোগীর প্রধানতম লক্ষণাবলীর প্রতি অধিকতর মনঃ-সংযোগ।

২। মেটিরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে গভীরতম জ্ঞান এবং প্রত্যেক ঔষধের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা।

৩। রোগী-পর্যবেক্ষণ ও ঔষধ-প্রয়োগ বিষয়ে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা।

উপর্যুক্ত কারণত্রয়ের মধ্যে যে কোন একটির অভাব ঘটলে, ঔষধ-নির্বাচনে তৎপরতা হওয়া অসম্ভব। রোগী পর্যবেক্ষণ-কালে তাঁরা রোগীকে এরূপভাবে পরীক্ষা করেন যে, রোগীর সামান্যতম লক্ষণটিও তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে না কখনও। আমাদের সাধারণ দেখার মধ্যে থাকে অনেক ত্রুটি,

অনেক ভ্রম। সর্বোপরি প্রত্যেক লক্ষণের কোন্‌টি অদ্ভুত, বা পরিচায়ক লক্ষণ, কোন্‌টি রোগীর ঔষধ-বাছাই-এ অধিকতর সহায়ক,—এ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি যেরূপ অস্বচ্ছ এবং বিচার-শক্তি যেরূপ অজ্ঞ, তাতে ঔষধ-নির্ণয় করা স্বভাবতই সময়-সাপেক্ষ। কোন একটি osteo-myelitis রোগে জনৈক-অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রোগী-পর্যবেক্ষণ ও ঔষধ-নির্বাচন ব্যাপারে ছিলেন নিযুক্ত। রোগীটি ছিল মেডিকেল কলেজ ফেরত এবং অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত রোগটির চিকিৎসা করা ছিল তাঁদের ধারণাতীত। ছাত্রদের নিয়ে অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ অধ্যাপক মহাশয়, রোগটির পূর্ণ ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণ শোনার পর,—ক্ষতটি দেখবার জন্য জনৈক ছাত্রকে ক্ষতের উপর থেকে ব্যাণ্ডেজটি সরাতে বললেন ; অতঃপর, সবাই মিলে ক্ষতের অবস্থাটি পরীক্ষা করবার পর, তিনি ছাত্রদের নিকট জানতে চাইলেন যে, রোগীটিকে কি ঔষধ দেওয়া চলতে পারে ? ছাত্রদের মধ্যে কেউ সাইলিসিয়া, কেউ ক্যাল্কে-ফ্লু ওর, কেউ অ্যাসাফিটি আবার কেউ বা সালফার বলে অভিমত প্রকাশ করবার পর, অধ্যাপক মহাশয় বললেন—না, এক্ষেত্রে **কেলি বাইক্রম** হচ্ছে এর ঔষধ। ছাত্রগণ উক্ত উত্তর শুনে যেমনি হলো বিস্মিত তেমনি অনুসন্ধিৎসু। সবাই প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করলে—"কেন, স্যার—কেলি বাইক্রমিকামের কি লক্ষণ আছে ?" অধ্যাপক মহাশয় তখন জনৈক ছাত্রকে একটি probe-director দিয়ে ক্ষতের থেকে একটু পুঁজ টেনে বার করতে বললেন। বার করবার সময় দেখা গেল যে পুঁজ

একটি লম্বা সুতোর মত probe-director-এর গায়ে লেগে ক্ষতের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। বিস্ময়ের প্রারম্ভিক ধাক্কা কাটলেও, আর একটা বিষয়ে কৌতূহল জাগলো মনে। অধ্যাপক মহাশয় কখন যে এটি লক্ষ্য করেছিলেন, তা কেউ বুঝতে পারে নি। রোগীটিকে তিনিও সেই প্রথম দেখলেন। কখন তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন, জানতে চাইলে, তাঁর জবাবে জানালেন যে, ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতের উপর ঢাকা তুলো উঠিয়ে নেবার সময় পুঁজটি সুতোর মত লম্বা হয়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল। আশ্চর্য এই যে, ছাত্রদের কেউই এদিকে নজর দেয় নি। এরই নাম হচ্ছে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ। এখানে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, উক্ত বালকটির জীবন ও পা দুই-ই রক্ষা পেয়েছিল কেলি বাইক্রমিকানের উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মেটিরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে গভীরতম জ্ঞান। মেটিরিয়া মেডিকা পঠন-পাঠনের প্রণালী আছে বহু রকমের ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা কার্যকারী প্রণালী কোনটি হবে, সেটি নির্ভর করে পাঠকের মননের উপর। কে কেমন ভাবে মেটিরিয়া মেডিকাকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন, তার থেকেই বোঝা যায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং তদীয় পাঠ-প্রণালীর কার্যকারিতা। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নেই যে, মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞান এমনভাবে হওয়া চাই যে, কোন একটি রোগী দেখা মাত্র যেন, তার মাধ্যমে ঔষধের চিত্রটি চিকিৎসকের মনের পর্দায় হুবহু প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এ যেন ক্যামেরায় ফটো তোলার মতো।

উক্ত ফটোগ্রাফিক ছাপ নেওয়াটি লক্ষণ মুখস্থ করা অপেক্ষা বিভিন্নতর। আমরা যেমন পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকেও প্রথম দর্শনেই চিনে নিতে পারি, এ-ও তেমনি রোগীর মধ্য থেকে ঔষধটিকে একনজরেই চিনে ফেলা। আমরা হয়তো আত্মীয় বান্ধবদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বর্ণনা দিতে পারব না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের চিনে নিতে পারবো। এখানে তার চেহারার একটা সামগ্রিকরূপ আমাদের মনে সর্বদাই থেকে যায়। ঔষধের বেলাতেও ঠিক তাই; এমনিতরো উপায়ে সামগ্রিক-ভাবে ওদের চেনা দরকার যে, যখনই সে রূপটি কোন রোগীতে দেখতে পাবো, তখনই যেন তাদের সাদৃশ্য ভুলে না যাই। এটি অভ্যাসের বিষয়; বারবার অধ্যয়ন ও বহু রোগীর সঙ্গে ঔষধের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁদের চিকিৎসক-জীবনের প্রথমে, উক্ত কার্যে বহু সময় ব্যয় করেন যথেষ্ট একাগ্রতায় এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ লক্ষণের গুরুত্ব বেশী, কোন্ রোগীর সামগ্রিক-লক্ষণ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক, কোথায় বা ধাতু-প্রকৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে ঔষধের পরিচয়, ঔষধাবলীর সঙ্গে রোগীর ও ঔষধের সম্বন্ধ—এ সমস্ত বিষয়েই জ্ঞান থাকা চাই পুরোদস্তর। তবেই তো সম্ভব হয় অতি অল্পায়াসে রোগীর একমাত্র সঠিক ঔষধ-বাছাইকরণ।

রোগী-পর্যবেক্ষণ এবং মেটিরিয়া মেডিকায় সম্পূর্ণ জ্ঞান

থাকলেও, কোন প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত অতি দ্রুত ঔষধ-বাছাই করা সহজসাধ্য হয় না। আমাদের চিন্তাশক্তি যে স্তরে পৌঁছলে বিনা-বিশ্লেষণ ও পদ্ধতিতে ঔষধ-বাছাই করা যায় অতি সহজে, সেটি হচ্ছে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ফল। সেইজন্য, যে সকল স্বনামধন্য-চিকিৎসকের নাম আমরা শুনতে পাই, তাঁদের সকলেই ছিলেন রোগী-পর্যবেক্ষণে দক্ষ, মেটিরিয়া মেডিকায় বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি বহুদর্শিতার ফলে রোগী ও ঔষধ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কাজেই, ঔষধ-বাছাই কার্যে স্বাভাবিক-পারদর্শিতা আসে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পর। তখন একটি রোগীকে অল্প-কথার মধ্য দিয়ে, কখন বা কোন একটি বিশেষ কার্যকরী লক্ষণের হদিশ পেয়ে, তাঁরা সহজেই এবং অল্প সময়েই সঠিক ঔষধটি বাছাই করে নিতে পারেন। এই বিশেষ ক্ষমতাটিকে বলা যায় intuition বা প্রজ্ঞাদৃষ্টি অর্থাৎ কোনরূপ প্রণালী বা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েও ঔষধ-বাছাই করবার একটা অদ্ভুত মানসিক-ক্ষমতা। এ বিষয়ে বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ-চিকিৎসকদের সঙ্গে মিশলে প্রত্যেকেই এমনিতরো অদ্ভুত ঔষধ-বাছাই ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারেন। কাজেই, উদাহরণমালা গেঁথে তোলা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—(ক), বিভাগ—১

ডাঃ কেন্টের নির্দেশিত লক্ষণসমূহের মূল্যমান তালিকা

(বামদিকের লক্ষণ, দক্ষিণদিকের লক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান)

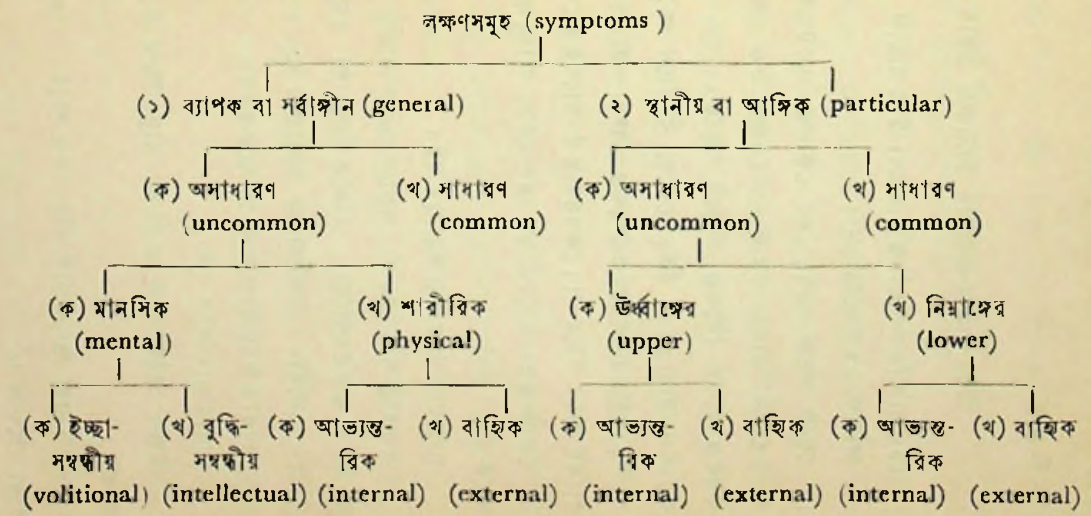

বিভাগ—২

ঔষধ-বাছাইকরণের কয়েকটি উদাহরণ

(১) গাণিতিক-পদ্ধতির সাহায্যে ঔষধ-বাছাই

জনৈকা ৮০ বছরের বৃদ্ধা।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, যেন কোনও একটা শক্ত জিনিস উপর পেটে নড়াচড়া করছে এবং সেজন্য উক্ত যন্ত্রণাটি কখনও কখনও বুকের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে। অল্প একটু স্পর্শ করলেও ব্যথা; > কিছু খেলে, বাঁ-পাশে শুয়ে থাকলে; < নড়াচড়ায়। লিভার-প্রদেশেও বেদনা—দক্ষিণপাশে একেবারেই শুতে পারে না; কেবলমাত্র বাঁ-পাশেই শুতে পারে।

কোষ্ঠবদ্ধতা আছে। মল ঢেলা ঢেলা, আমযুক্ত এবং দুর্গন্ধ থাকে।

দুপুরের দিকে অল্প অল্প জ্বর হয়।

অক্ষুধা; বমি হয় < সকালে ও সন্ধ্যায়। বমি সবুজ রং-এর ও কফ মেশানো। বমিতে তিক্তাস্বাদ থাকে।

পিপাসাহীন। অতিরিক্ত লালাস্রাব < বেদনাকালে।

বেদনার সময় পাণ্ডুলি অবশ মনে হয়।

মাথার ডানদিকে ব্যথা।

শীতল জলে স্নান ও শীতল বায়ু পছন্দ করে। গরম-কাতর।

মিষ্ট দ্রব্য ও ঠাণ্ডাপানীয় পছন্দ করে। নোনতা খেতে ইচ্ছা থাকে না।

সহজেই কান্না পায়; মনে করে যে, রোগটি আর ভাল হবে না।

শূন্যোদ্গার উঠলেও, বেদনার নিবৃত্তি হয় না।

রোগের পূর্বেতিহাস—গত মাঘ মাসে (১৩৭৩ সাল) উদরাময়ে ভোগে; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ভালো হয়। পরে নাভিপ্রদেশে তীব্র ব্যথা হয়, কিন্তু আপনা-থেকে সে ব্যথা চলে যায়। কিন্তু, ২।৩ দিন পরে পুনরায় বেদনার সূত্রপাত হয় এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বেদনা দূর হয়। এবার; ব্যথা আরম্ভ হয়, প্রায় একমাস আগে থেকে, প্রথমে বমি হয়, পরে বেদনা দেখা দেয়। সে সময় বমি হলে বেদনার কিছুটা উপশম হতো।

এ ছাড়া, ১৭।১৮ বছর আগে রোগিনী ন্যাবা (jaundice) রোগে দীর্ঘদিন ভোগেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। প্রায়ই আমাশয়ে ভুগে থাকেন।

রোগী-পরীক্ষা—লিভার-প্রদেশে ও এপিগ্যাস্ট্রিক-প্রদেশে স্পর্শকাতরতা (tenderness) প্রকাশ পায়। নাড়ীর গতি মিঃ ৮৮ বার। বয়সের ভারে ও রোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য অবস্থা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়।

এক্ষণে যে-লক্ষণগুলির সাহায্যে ঔষধ-বাছাই করা হয়েছিল, সেগুলি হলো—

(১) ক্রন্দন প্রবৃত্তি, (২) গরমকাতর, (৩) জীবনে হতাশাবোধ, (৪) দক্ষিণ পার্শ্বে শুতে পারে না, (৫) পিপাসা-

হীনতা, (৬) অক্ষুধা, (৭) মিষ্ট দ্রব্যাদি পছন্দ করে এবং লবণাক্ত দ্রব্যে অনিচ্ছা, (৮) তিক্তাস্বাদযুক্ত বমন, (৯) পেটে ব্যথা < নড়াচড়ায় এবং (১০) কোষ্ঠবদ্ধতা।

ক্রন্দন প্রবৃত্তিটিকে এখানে বাছাইকারী লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়েছে এবং কেবলমাত্র গরমকাতর ঔষধগুলিকেই লক্ষণানুযায়ী বাছাই করা হয়েছে। এক্ষণে, আমরা লক্ষণ-কোষ সাহায্যে উক্ত লক্ষণগুলিতে কী কী ঔষধ কোন্ কোন্ মান বা মূল্যের অনুপাতে নির্ণয় করেছিলাম, তার উল্লেখ করলাম এখানে—

পালস—$৭^{৩৩}$, নেট্রাম মিউর—$৭^{৩১}$, আর্জেণ্ট-নাই—$৮^{৩০}$, লাইকো—$৬^{২৯}$, ক্যাল্কে,—$৫^{২৪}$, ম্যাগ-মিউর—$৫^{১৬}$, অ্যান্টিম-ক্রুড—$৪^{১৬}$ ইত্যাদি।

১।৩।৬৬—পালস ০।৩০, শক্তিপরিবর্তন রীতিতে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার।

২।৩।৬৬—বেদনা মাঝে মাঝে কমে এবং কখনও কখনও বাড়তে থাকে। ঔষধ পূর্ববৎ।

৩।৩।৬৬—বেদনা পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। বিশেষ বৃদ্ধি হয় না। ঔষধ পূর্ববৎ।

৪।৩।৬৬—বেদনা একেবারে হয় নি। অনৌষধি।

৮।৩।৬৬—কোষ্ঠবদ্ধতা, অক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণের কোনও উন্নতি না হওয়ায় নেট্রাম মিউর—২০০, ১ মাত্রা।

১০।৩।৬৬—পায়খানা হয়, গুট্‌লে গুট্‌লে মল। রোগীর ক্ষুধাও পায়। অনৌষধি।

২৪।৩।৬৬—দক্ষিণ প্রদেশে একটু ব্যথা-ব্যথাবোধ করে। কোষ্ঠবদ্ধতা মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রস্রাব লাল। লাইকো ০।৬, শক্তিপরিবর্তন রীতিতে ২ দিন প্রাতে পর পর।

অতঃপর রোগী সব দিকেই ভালো থাকে এবং অন্য কোনও ঔষধ প্রয়োজন হয় নি। অবশ্য বার্ধক্যের উপসর্গ কিছু কিছু থাকলেও, বেদনা ইত্যাদিতে আর ভোগে নি এতাবৎকাল।

(২) গাণিতিক-পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাপক-লক্ষণের গুরুত্ব অনুযায়ী ঔষধ বাছাই—

কুমারী...ঘোষ, গ্রাম—কালিকাপুর, পোঃ ধবনী, জেলা—বর্ধমান। বয়স—১৩। ডান হাতের মাঝের আঙুলে এবং বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে বহুদিনের রসহীন একজিমা জাতীয় উদ্ভেদ; < রাত্রে বাড়ে; > গরম সেঁক দিলে। কখনও কখনও পুঁজ হয়, তখন বেশ বেদনা থাকে। ডান গালে একটি আটআনির মত গোলাকার বাদামী দাগ। অন্য কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ ছিল না। অবশ্য, সমস্ত শরীরে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে চুল্‌কোতে থাকে কিন্তু কোনও উদ্ভেদ দেখা যায় না। ঘুমোবার সময় দাঁত কড়্‌মড়্‌ করে। পায়খানায় মাঝে মাঝে কৃমি দেখা যায়। ক্ষুধা স্বাভাবিক। ঝাল ও নোন্‌তা জিনিস খেতে ভালোবাসে; দুধ ও মিষ্টি তত পছন্দ করে না। কপালে ঘাম হয় প্রচুর। মেজাজ—খিট্‌খিটে; লোকজনের সঙ্গ অত্যন্ত ভালোবাসে (বাপের ভাষা হলো—'লোকজনের ভারি ন্যাওটা'), স্নানে আরাম পায়।

রোগেতিহাস—২ বছর আগে আর একবার একজিমা (?) হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি নানারকমের ওষুধ (?) খেতে খেতে মিলিয়ে যায়।

বংশেতিহাস—বাপের 'সোরাইসিস' রোগ আছে।

রোগী-পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় নি।

নিম্নোক্ত ব্যাপক-লক্ষণগুলি এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ল্যাক ক্যানাইনামের ইঙ্গিত করে—

(১) ঝাল ও নোন্‌তা ভালোবাসে—*ল্যাক ক্যানাই (কেন্ট রেপার্টরি, পৃঃ ৪৯৭)

(২) মিষ্ট দ্রব্যাদি পছন্দ করে না—ল্যাক ক্যানাই (ঐ, পৃঃ ৪৯৩)

(৩) **লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালবাসে—ল্যাক ক্যানাই** (ঐ, পৃঃ ২২)

—এই লক্ষণটিই বাছাইকারী হিসাবে কাজ করে।

(৪) মেজাজ খিট্‌খিটে—*ল্যাক ক্যানাই (কেঃ রেপাঃ, পৃঃ ৬৭)

(৫) স্নানে আরাম পায়—*ল্যাক ক্যানাই (ঐ, পৃঃ ১৩৫৮)

অতএব, ৪।৩।৬৪—ল্যাক ক্যানাই ২০০ একমাত্রা প্রদত্ত হয় এবং ৭ দিনের অনৌষধি।

২২।৩—পূর্ববৎ অনৌষধি।

৭।৪—একজিমাগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেছে ; এক-মাসের মত অনৌষধি।

৪।৫—রোগিনী সম্পূর্ণ ভালো আছে। আজ পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য গোলযোগ হয় নি।

ব্যাপক-লক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে লক্ষণকোষ সাহায্যে গাণিতিক-পদ্ধতি অবলম্বনে ল্যাক ক্যানাই বাছাই করা হয় এবং তার কাজও দেখা যাচ্ছে বিস্ময়কর। এই রোগীর চিকিৎসাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যাপক-লক্ষণগুলির যদি সঠিক সদৃশ ঔষধ পাওয়া যায়, তবে স্থানীয় লক্ষণগুলিও সহজেই দূর হয়।

(৩) সহচর-লক্ষণের নীতি অনুযায়ী ঔষধ-বাছাই

শ্রীযুক্ত বি চ,··· ; দুর্গাপুর—৪, বয়স—৩৬। ক্লার্কের কাজ করেন।

দক্ষিণ 'লাম্বার' অংশে তীব্র ব্যথা এবং উহা পেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে (রোগী অবশ্য হাত দিয়ে উক্ত অংশগুলি দেখাচ্ছিলেন); বেদনা কখনও কখনও মেরুদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাঝে মাঝে তীব্র অসহ্য ব্যথা ছাড়াও, ঘিন্-ঘিনে ব্যথা প্রায় সব সময়ই থাকে। যতবার তীব্র ব্যথা হয়েছে প্রত্যেকবারই রাত্রিকালে এবং সকালবেলা তা কমে গেছে। < চাপ দিলে ; > হাত বুলোলে। তীব্র ব্যথার সময় বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

কখনও কখনও অল্প মাথাব্যথা হয়, যে জন্য সে-সময় প্রায়ই অ্যানাসিন খায় ; ঘাড়ে মালিশ করলে আরাম হয় ; <পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যাকালে।

গরমকাতর। ক্ষুধা ভালোই। উষ্ণ খাদ্য ও পানীয়ে স্পৃহা। নিদ্রা স্বাভাবিক। মল-মূত্রও তাই। ঘর্ম প্রচুর বিশেষত মস্তকে। মেজাজ শান্ত; পূর্বে লোকজন ভালো-বাসতো, এখন কাজকর্মই বেশী পছন্দ করে।

রোগেতিহাস—প্রথম তীব্র আক্রমণ হয়—২৭এ মার্চ ১৯৬৬; পরবর্তী আক্রমণের তারিখগুলি হলো ক্রমান্বয়ে—৩০এ এপ্রিল, ৬ই মে, ২৯এ ও ৩০এ জুন। এবং শেষ আক্রমণ সুরু হয়—১২ই জুলাই। তার জের গত ৭ দিন যাবৎ চলছে।

বাল্যকালে প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতো। বেদনার সময় বরাবরই পেথিড্রিন ব্যবহার করা হতো।

বংশেতিহাসে—উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় নি।

রোগী-পরীক্ষায় দেখা গেল—জিহ্বা আর্দ্র ও লেপাবৃত; পেটে চাপ দিলে আরামবোধ করছে। অন্যান্য অঙ্গে বিশেষ কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় নি। সহচর-লক্ষণের নীতি অনুযায়ী লক্ষণাবলীর মূল্যমান স্থির করা হয় নিম্নোক্ত ভাবে—

১। আঙ্গিক অবস্থান—দক্ষিণ-পার্শ্বে; পৃঃ ১৪১৩ (কেন্টের রেপার্টরি দ্রষ্টব্য)
'লাম্বার'-অংশে (অর্থাৎ কিডনী দ্রষ্টব্য), পৃঃ ৬৭৫, ঐ

২। অনুভূতি—কাটাছেঁড়ার মতো বেদনা, পৃঃ ৬৭৯
অবশকর, পৃঃ ৬৭৫

প্রসারণশীল (অর্থাৎ radiating), পৃঃ ৬৭৯
বেদনা পেট পর্যন্ত ধাবিত হয়, পৃঃ ৬৭৬

৩। হ্রাসবৃদ্ধি—< রাত্রে (অর্থাৎ শয়নকালে), পৃঃ ৬৭৬
< চাপে, পৃঃ ১৪০৫

৪। সহচর-লক্ষণ—লোকজন পছন্দ করে, পৃঃ ২২
গরমকাতর, পৃঃ ১৩৭৯
উষ্ণখাদ্যে ও পানীয়ে স্পৃহা, পৃঃ ৪৯৭

লক্ষণকোষ ঘাঁটলে লাইকো-ই একমাত্র সর্বোচ্চমানের অ্যান্টিসোরিক ঔষধ; কিন্তু ব্যথার তীব্রতা চলতে থাকায়, কোনও সুগভীর ক্রিয়াশীল অ্যান্টিসোরিক ঔষধ দেওয়া নীতিসঙ্গত নয় বিবেচনা করে একটি মধ্যম ক্রিয়াশীল ঔষধ বার্বেরিস ভাল্গা ২০০ প্রদান করি; লক্ষণানুযায়ী বার্বেরিসের মূল্যমান লাইকোর অনুবর্তী। ঔষধ-সেবনের পর ঐ দিন রাত্রে বেদনা সর্বাপেক্ষা চরমে ওঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে রোগী নিজেকে একেবারে রোগমুক্ত মনে করে। ১৯।৭ বার্বেরিস পড়ে, এবং তারপর অনৌষধি চলতে থাকে। ১৭।৮ পুনরায় বেদনার প্রকোপ দেখা দিলে, উক্ত ঔষধই শক্তিপরিবর্তন রীতিতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা হয়। বেদনা—ধীরে ধীরে পুনরায় কমে যায়। এবার বেদনাশূন্য অবস্থায় ৭ দিন কাটবার পর পুনরাক্রমণ রোধের আকাঙ্ক্ষায় লাইকো ১০০০ একমাত্রা দেওয়া হয়। তারপর থেকে আর কোনও বেদনা হয় নি; অবশ্য রোগী এখনও পর্যবেক্ষণে আছেন; গত এক বৎসরকাল মধ্যে বেদনার কোনও প্রকোপ

আর দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে, সহচর-লক্ষণাবলীর তাৎপর্যও বিশেষ লক্ষণীয়।

(৪) কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ-বাছাই

শ্রীমতী···। বয়স ৩৫; কোমরের মধ্যস্থান থেকে দক্ষিণ 'হিপ'সন্ধি পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; বেদনা দুপুরের পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়ে এবং অসহ্য হয়ে উঠে। রাত্রেও বেদনাধিক্য থাকে; প্রাতঃকালে কিছুটা উপশম হয়। < চলাফেরা করলে, চাপ দিলে, দাঁড়িয়ে থাকলে। > চুপচাপ বসে থাকলে, গরম সেঁক দিলে। ডান পাটি মাটিতে পাততে পারে না; অত্যন্ত বেদনার জন্য দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় আলগোছা ভাবে এক পায়ে হেঁটে আমার চেম্বারে ঢুকলো—এটুকু লক্ষ্য করেছিলাম।

কখনও কখনও পেটে ব্যথা হয়; বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে বাড়ে, নিচ থেকে উপরদিকে ব্যথার গতি; > খাবার পর; < খালি পেটে। > আক্রান্ত পার্শ্বে শুয়ে থাকলে। ক্ষুধা অত্যন্ত কম, অল্প একটু খেলেই পেট ভর্তি হয়ে যায়। মল স্বাভাবিক ধরনের।

গরম, টক, নোনতা খাবারে ইচ্ছা এবং মিষ্ট-দ্রব্যাদি খেতে অনিচ্ছা।

মুখের স্বাদ তিক্ত; পিপাসাহীন।

মৃদু প্রকৃতির স্বভাব। লোকজনের সঙ্গ ভালো লাগে না। নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতিও বিতৃষ্ণা।

মাসিক নিয়মিত ও স্বাভাবিক। শ্বেত প্রদর জলবৎ। দিবাভাগেই অধিক।

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদি খাবার পর থেকে গা চুলকাতে সুরু করেছে।

রোগের পূর্বেতিহাস—২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৭২ সালে ঘাড়ে ও পায়ে টানযুক্ত ব্যথা অনুভব করে। একদিন ডান পায়ে খেঁচ্‌কা লাগে এবং তারপর জ্বর সুরু হয়। ইঙ্গুইন্যাল-প্রদেশে ব্যথাবোধ করে। উচ্চতাপসহ জ্বর ২৬ দিন পরে ছেড়ে যায়।

অতঃপর একদিন বৃষ্টিতে ভিজবার পর উক্ত পাছার নিকট বেদনার সূত্রপাত হয়।

মোট ২ বার টিকা নিয়েছিল এবং একজিমা জাতীয় রোগও একবার হয়েছিল।

বংশেতিহাস—উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; কথাপ্রসঙ্গে যা বোঝা গেল, তাতে সম্ভবত স্বামীর গনোরিয়া ও মায়ের বাতরোগ ছিল।

রোগী-পরীক্ষায় দেখা যায় যে, রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল, অস্থিচর্মসার। দক্ষিণ 'হিপ' সন্ধিস্থলে একটু চাপ দিলেই বেদনা বাড়ে। নাড়ীর গতি মিনিটে ৮০ বার। অন্যান্য যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যকৃৎ ও প্লীহা স্থানে চাপ দিলে বেদনা অনুভব করে। রক্তাল্পতাও লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ উরুতে একটি ফ্যাটি টিউমার দেখা যায়।

ঔষধ-নির্বাচনকালে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়—(১) লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করেন, (২) স্বভাব মৃদু প্রকৃতির, (৩) পিপাসাহীনতা, (৪) অক্ষুধা, (৫) শীত-কাতরতা, (৬) লবণ ও অম্লদ্রব্যে স্পৃহা, (৭) পেটবেদনা > আহারে, (৮) দক্ষিণ 'হিপ' সন্ধিতে ব্যথা ও উহার প্রকৃতি।

লক্ষণকোষ অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, সর্বোচ্চমানের ঔষধ হলো লাইকো এবং পরবর্তী মূল্যমানবিশিষ্ট ঔষধ হলো রাস টক্স।

এক্ষেত্রে, প্রথমে লাইকো দেবার ইচ্ছা থাকলেও বৃষ্টিতে ভিজে রোগের সূত্রপাত হেতুটির উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে প্রথম ব্যবস্থা-পত্র-হিসাবে, ১১।২।৬৬ রাস টক্স ০।৩০, শক্তি-পরিবর্তন রীতিতে ২ দিন দিতে বললাম এবং ৭ দিন পর সংবাদ দিতে বললাম।

১৮।২।৬৬ সংবাদ পাওয়া গেল যন্ত্রণার অনেকখানি উপশম হয়েছে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় নি। পুনরায় পূর্ববৎ ঔষধ দিয়ে ১৫ দিন পর সংবাদ দিতে বললাম।

২।৩।৬৬ সংবাদ পেলাম—(১) খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারছে; (২) শারীরিক উন্নতি দেখা যাচ্ছে এবং (৩) ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, পুনরায় ১৫ দিনের অনৌষধি।

১৭।৩।৬৬—উন্নতি অব্যাহত, পূর্ববৎ অনৌষধি।

১২।৪।৬৬—পেটের লক্ষণগুলির বৃদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং লাইকো ২০০ একমাত্রা। মাসখানেকের মত অনৌষধি। এক্ষণে সমস্ত যন্ত্রণা চলে গেছে, কিন্তু কতকগুলি ধাতুগত লক্ষণ

প্রকাশ পায়। ফলে, তাকে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে নেডোরিনাম ও পরে সিপিয়া দেওয়া হয়। রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে, এমন কি টিউমারটিও ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়। দীর্ঘ এক বৎসরকালের মধ্যে কোনও রোগ জ্বালার সংবাদ নেই। স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে।

পরিশিষ্ট—(খ)

লক্ষণ-লিপিকরণের খাতার ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

রোগীর নাম শ্রী.....
বয়স—৩৩ ঠিকানা—মানবাজার, মানভূম

প্রণালী—বাছাইকারী লক্ষণ হিসাবে শীতকাতরতাটির উপর নির্ভর করে, এক্ষেত্রে কেবলমাত্র শীতকাতর প্রধান ঔষধাবলীকেই বাছাই করা হয়েছে।

রোগী বর্ণিত লক্ষণাবলী	বিন্যস্ত লক্ষণাবলী	কেন্ট রেপার্টরি থেকে বাছাই করা ঔষধের তালিকা
আমার পেটে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভয়ানক বেদনা হচ্ছে, পেটে অনেক সময় গ্যাস জমে; খাবার পরেই গ্যাস বেশি হয়।	১। উদ্বিগ্নতাবোধ, অপরের জন্য, (পৃঃ ১৭)	*আর্স, ককুলাস, *ফস, ব্যারাই-কা।
পেটে শব্দ হয় অত্যন্ত হড়্‌হড়্‌ গড়্‌-গড়্‌। এই ভাবটি আমার চলতে থাকে যতক্ষণ না আবার কিছু খাই, ততক্ষণ পর্যন্ত। খাবার পর বেদনাও কমে, গ্যাসও কমে।	২। সন্দেহপ্রবণ (পৃঃ ৯৫)	*অরাম, **আর্স, কস্টি**, *ককু, কার্বো-সা, **কেলি আর্স**, *কেলি-ফ, কোনি, ক্যান্থা, ক্যামো, *ক্যাল্কে-ফ, গ্র্যাফা, চায়না, *নাইট্রি-অ্যাসি, নাক্স-ভ, *নেট্রাম আর্স, *নেট্রাম কার্ব, প্লাম্ব, *ফস, *বেলে, *বোরাক্স, **ব্যারাই-কা**, *ব্যারাই-মি, ভায়ো-টা, মিউরি-অ্যা, **রাস-ট**, রুটা, সাইলি, *সালফ-অ্যা, সিপি, সিমি, স্ট্যানাম, স্ট্যাফি, **স্ট্র্যামো**।
ক্ষুধা বড় কম। আজ প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ চা-পানের অভ্যাস।	৩। ভয়, চোরের (পৃঃ ৫৭)	*ইগ্নে, **আর্স**, অ্যালুমি, *কোনি, জিঙ্কাম, নেট্রাম-কা, *ফস, বেলে, ম্যাগ-কা।
পায়খানা অবশ্য মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়।	৪। ভয়, একটা কিছু ঘটবে (পৃঃ ৫৫)	*আর্স, অ্যালুমি, **কস্টি**, *কার্বো-ভে, *ক্যাল্কে, কেলি-ফ, *কেলি আর্স, গ্র্যাফাই, নেট্রাম-আ, **ফস**, ম্যাগ-কা, ম্যাঙ্গানাম।
নোন্‌তা আর মিষ্টি দুয়ের দিকেই ঝোঁক। টক খেতে পারি না।	৫। ভয়, শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার (পৃঃ ৫৭)	কার্বো-অ্যানি, *ফস, স্ট্র্যামো।
একটুতেই অস্থির হয়ে পড়ি। পাতলা চেহারা।	৬। ভয়, লোকের ভীড়ে (পৃঃ ৫৩)	আর্স, অ্যালো, কস্টি, কার্বো অ্যানি, *কেলি-আ, কেলি-কা, কেলি-ফ, কেলি-বা, কোনি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফাই, *নাক্স-ভ, নেট্রাম-আ, নেট্রাম-কা, ফস, ফেরাম, ব্যারাই-কা, রাস-ট, স্ট্র্যামো, হিপার।
রোগীকে প্রশ্ন করে জানতে পারি—রোগীর মনে ভয় আছে নানা রকমের, যেমন চোরের ভয়, কোন অঘটন ঘটবার ভয়, লোকের ভীড়ের ভয়। অপরের জন্য উদ্বিগ্ন-ভাব। দমবন্ধের ভয়। মন অনুভূতি-প্রবণ।	৭। ক্রোধপ্রবণ (পৃঃ ৭৯)	*অরাম, *আর্স, অ্যাগা, *অ্যালুমি, ককু, *কস্টি, কার্বো-ভে, কার্ব-সা, ক্যামো, *ক্যাপ্সি, ক্যাম্ফ, *ক্যাল্কে, *গ্র্যাফাই, চায়না-অ, চায়না, চেলিডো, *জিঙ্ক, **নাক্স-ভ**, *পেট্রো, ফস, বোরাক্স, ব্যানা-ব, *সাইক্ল্যা, সার্সা, *সিপি, *স্পাই, স্ট্র্যামো।
রোগী শীতকাতর।	৮। <ঝড়ের সময় (পৃঃ ১৩৬)	অরাম, *অ্যাগা, *কস্টি, *কেলি বাই, নাইট্রি-অ্যা, *নেট্রাম-কা, পেট্রো, *ফস, **রডো**, *রাস-ট, সাইলি, সিপি, **সোরি**, হাইপে।
<ঝড়বাদলে ও শরৎকালে। একটুতেই অধৈর্য হয়। মন বড় সন্দিগ্ধ। একটুতেই রেগে যায়। চমকে ওঠে সহজেই ইত্যাদি, ইত্যাদি।	৯। অনিচ্ছা, টকে (পৃঃ ৪৯১)	ইগ্নে, ককু, নাক্স-ভ, ফস-অ্যা, ফেরাম, *বেলে, **স্যাবাডি**।
	১০। ইচ্ছা, লবণ (পৃঃ৪৯৭) ইত্যাদি, ইত্যাদি।	ককু, *কস্টি, **কার্বো-ভে**, কোনি, *ক্যাল্কে, *ক্যাল্কে-ফস, নাইট্রি-অ্যা, প্লাম্ব, **ফস**। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নির্ঘণ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
অচিররোগ	১০৯, ১২৮, ১৬৫
অনিচ্ছা-ইচ্ছা	৬৬
অনুভূতি	১৩০, ১৩৪, ১৩৫
অবজেকটিভ লক্ষণ	২৪
অবস্থা, হ্রাসবৃদ্ধির	১৩৬, ১৩৭
—, পারিপার্শ্বিক	৬৪, ৬৫, ১৩৬
অবস্থান	১৩০
—, আঙ্গিক	১৩১, ১৪২
—, সর্বাঙ্গিক	১৩১, ১৩৩, ১৩৪
অসম্পূর্ণতা, রোগীলিপির	২৫
অসম্পূর্ণ লক্ষণ	১৩৯
আঘাত-জনিত পীড়াদি	১৫১
আহার ও পানীয় হেতু	১৫১
'আঁকা-বাঁকা' ভাবে রোগী আরোগ্য ...	৭৯
ইতিহাস, সোরার	৮৯
উত্তেজক কারণ	১৫০
উত্তাপজনিত পীড়াদি	১৫৫
উদাহরণ, লক্ষণলিপিকরণ ছকের ...	১৯২
একাঙ্গিক রোগ	১১৩
অ্যান্টিসাইকোটিক	১০৩
অ্যান্টিটিউবারকুলার ঔষধাবলী ...	১২৩
অ্যান্টি-সোরিক	১০৩-১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ্যান্টি-সিফিলিটিক	১০৩-১০৫
—, সাইকোটিক	১০৩-১০৫
ঔষধ বাছাই-বিদ্যা	৫৮
—, শীতকাতর	৭৪, ৮০
—, গরমকাতর	৭৫, ৮১
—, বহুক্রিয়	২০
—, সদৃশ	৭৯
—, সদৃশতম	৭৯
—, শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ে কাতর ...	৮২
ঔষধের কার্য	১১৩
—, ক্রিয়াকাল	৯৮
—, স্তর বিভাগ	৬২
—, কাঠামো	১২৫
কারণ, উত্তেজক	১৫০
—, স্থায়ী	১৫০
—, হ্রাসবৃদ্ধিজাত	১৫০
গনোরিয়া	৯৩
চতুর্থ স্তরের ব্যাপক লক্ষণ ...	৬৭
চক্রাবর্ত-প্রণালী	৮৭, ৯৯, ১০৬
চর্মোদ্ভেদ-জনিত পীড়াদি	১৫৫
চিকিৎসকের কাজ	৬২
চিররোগে একাধিক ঔষধের প্রয়োজনীয়তা ...	৮০
চিররোগের প্রকৃতি ও তাহার প্রতিকার ...	৯৯, ১০৮
ছক, লক্ষণ সংগ্রহের	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার	১৫৫
জীবনীশক্তির কার্য	১১৩
টিউবারকুলার	১২৩
ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়াদি	১৫৮
ডাক্তার কেন্ট	৫৯, ৭১
—, জন উইয়ার	৭৩
—, মহেন্দ্রলাল সরকার	১৪৭
—, মার্গারেট টাইলার	৭৩
—, মিলার	৭৫
—, ন্যাশ	১৫০
—, রাজেন্দ্রলাল দত্ত	১৪৭
ত্রিদোষ-চক্র	৯৬
দোষের সংমিশ্রণে রোগের জটিলতা ...	৯৪
দ্রুত-ঔষধ বাছাইয়ের নিয়ম	১৬৯
নানাবিধ কারণজনিত পীড়াদি ...	১৬২
"না" বাচক লক্ষণাবলী	৭৩
নোট বই, লক্ষণ লিপিকরণের ...	৩৩
পর্যবেক্ষণ	১৭১
পারিপার্শ্বিক-অবস্থা	৬৪, ৬৫, ১৩৭
পুনঃপ্রয়োগের সময়	১০২
প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ...	৬৪
প্রণালী-সমূহের প্রয়োগক্ষেত্র ...	১৪
'প্রবণতা'-দোষ বিনাশের উপায় ...	১১৩
'বাছাইকারী'-লক্ষণ	৭৪, ৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৬
ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণ বাছাই পন্থার ত্রুটি ...	৬০, ৬১
ব্যাপক ও স্থানীয় লক্ষণ বাছাইয়ের উপায় ...	৫৯
ব্যাপক-লক্ষণের মূল্য	৮৬
ব্যষ্টিকরণ	১৬৫
বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ লক্ষণ	৭০, ১১৩
ভ্যাক্সিনেশন ও সাইকোসিস ...	৯৪
মহামারী	১৬৫
মহামারী-চিকিৎসার নীতি ...	১৬৭
'মারী'-ঔষধতত্ত্ব	১৬৫
মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা	৬৪
মানসিক লক্ষণের বিভিন্নতা ...	৬৩
মেটিরিয়া মেডিকা কী	১৫
রজঃস্রাবের লক্ষণ, কোথায় ব্যাপক, কোথায় স্থানীয়	৬৭
রোগী-পর্যবেক্ষণ	১২৯
রোগী-বিবরণী ৮২, ১১১, ১১৯, ১২৫, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৭০	
রোগজ বৃদ্ধি	১৩৮
রোগের গতিশীল অবস্থা	১১২
—, স্থিতিশীল অবস্থা	১১২
—, নামকরণের প্রয়োজনীয়তা ...	৯৪
রোগোৎপাদিত-লক্ষণ	১১৩
রোগ কী	১৬৬
লক্ষণ, বাছাইকারী	৭৫, ৭৬. ৭৯
—,লিপিকরণ	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষণ, ব্যাপক	৫৯
—, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের	১৩৩
—, মানসিক	৬২
—, সহচর	২৮
—, সম্পূর্ণাঙ্গ	১৩৯, ১৪০
—, সাধারণ	৭২, ৭৭
—, স্থানীয়	৫৯, ৬৮
লক্ষণকোষ কী	১৫
—, কেন্টের	৮৩
—, ডাঃ বোনিংহোসেনের	২১
—, লিপের	২১
লক্ষণকোষের আবশ্যকতা	১৬, ১৭
লক্ষণকোষস্থ 'ঔষধের স্তর বিভাগ ...	৬২
লক্ষণাবলী, 'না'-বাচক	৭৩
—, ঔষধ-নির্বাচক	৩০
লক্ষণাবলীর গুরুত্ব	১১৭
লক্ষণাবলী, সিদ্ধিপ্রদ	২৯
—, রোগ-নির্ণায়ক	২৯
—, সামগ্রিকতা	১২৯
লক্ষণের মূল্যমান	৭৮
সর্দি হওয়া হেতু পীড়াদি	১৫৮
শারীরিক বিভাগ	১৩২
শীতকাতর ঔষধাবলী	৭৬, ৮০
সদৃশ ঔষধ	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সদৃশতম ঔষধ	৭৯
সর্বাঙ্গিক-অবস্থান	১৩১, ১৩৩, ১৩৪
সহচর-লক্ষণ	১৪০
সহচর লক্ষণের নীতি	১৪০, ১৪২
সাইকোসিস	৯৩-৯৪
সাইকোসিসের লক্ষণ	৯৩
সাধারণ লক্ষণ	৭৭
সাধারণ-লক্ষণ কখন অসাধারণ হয় ...	৭২
সাবজেকটিভ লক্ষণ	২৪
স্থায়ী-কারণ	১৫০
স্থানীয়-লক্ষণ	৬০, ৬৮
সিফিলিস	৯৯, ১০২
সিফিলিসের ত্রয়ী অবস্থা	৯৯
সিফিলিস-জ্ঞাপক লক্ষণ	১০০
সিফিলিস ও সুপ্ত-সোরা	১০০
সোরা	১০৬
—, রোগাবলীর তালিকা	১০৮
—, চিকিৎসায় প্যাথলজিক্যাল লক্ষণের মূল্য ...	১১১
সোরার ইতিহাস	৯০
—, চিকিৎসায় সতর্কতা	১০৬
—, প্রথম বহিঃপ্রকাশ	১১৭
—, দুশ্চিকিৎস্য অবস্থা	১১১
—, বহুমুখিতা	১১৩
—, বিস্তৃতি ও গভীরতা	১১৬-১১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সোরার শ্রেণী বিভাগ	১০৯
স্বকীয়তা	৩০
হোমিওপ্যাথিক-প্যাথলজি... ...	৯২
হোমিওপ্যাথির মর্মবাণী	৫৯
হ্রাসবৃদ্ধি	২৫, ১৩০
হ্যানিম্যানের লক্ষণ-সংগ্রহের ছক ...	৩৩

লেখক-পরিচিতি

ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ডি এম এস একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। জন্ম—১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে পুরুলিয়া শহরে। পিতা পূর্ণেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুখ্যাত হোমিওপ্যাথ। তিনি পুরুলিয়া জেলা স্কুলে ও বাঁকুড়া খ্রীস্টিয়ান কলেজে সাধারণ শিক্ষা ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে চিকিৎসক-জীবন সুরু করেন। পিতার প্রেরণায় ও চিকিৎসা-গুরু বি কে বসু, এম ডি এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর সাহচর্যে ও শিক্ষায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রথম ভাগে তিনি পুরুলিয়া জেলায় ও বর্তমানে দুর্গাপুরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

তিনি তপানন্দ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য-চিকিৎসালয় ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (পুরুলিয়া) প্রধান চিকিৎসক ও সম্পাদক (১৯৫৬-৬১), জেনারেল কাউনসিল এণ্ড স্টেট ফাকালটি অব মেডিসিন (কাউনসিল অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন) পশ্চিমবঙ্গের সদস্য তথা পরীক্ষক পদে (১৯৬০-৬৪), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক ও অন্যান্য পদে (১৯৬১—), দুর্গাপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ পদে (১৯৬৮—), বর্ধমান জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (১৯৭৩—), পুরুলিয়া জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক ও অন্যান্য পদে (১৯৬১—), পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল হস্‌পিটাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পদে (১৯৬৯—), আসানসোল হোমিও হসপিটাল, হেল্‌থ এণ্ড রিসার্চ অর্গানিজেশন-এর সদস্য পদে (১৯৭২—), দুর্গাপুর হামিও আউট-ডোর ডিস্পেনশারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি (১৯৭৩—), অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাঁর কর্মদক্ষতা প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত তিনি 'নিরাময়' ও 'হোমিওজ্যোতি' পত্রিকা দুটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক (১৯১৯-৬৭)। তিনি বাঁকুড়া জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের অবসরে বহু ইংরেজি ও বাংলা সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

আমাদের প্রকাশিত বাংলা পুস্তকাবলী

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখগহ্বরের যন্ত্রনমূহের পীড়া ও তাহার
চিকিৎসা—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, ২য় সং
সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা—ডাঃ আর কে মুখার্জী, ১১শ সং
বেরিবেরি—ডাঃ এল এম পাল, ৩য় সং
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস এম ভড়, ৯ম সং
শিশুরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস এম ভড়, ১০ম সং
চিররোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার—ডাঃ এস চ্যাটার্জী, ৫ম সং
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৬ষ্ঠ সং
ভারতীয় ঔষধাবলীর সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব—ডাঃ কে এন বসু, ১২শ সং
বাতরোগ চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৭ম সং
বসন্ত ও হাম চিকিৎসা—ডাঃ কে এন বসু, ৫ম সং
ব্লাড-প্রেসার—ডাঃ কে এন বসু, ৫ম সং
সরল বক্ষঃস্থল পরীক্ষা—ডাঃ কে এন বসু, ৪র্থ সং
ঔষধ বাছাই প্রণালী—ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ সং
ফিজিওলজি—ডাঃ জে চ্যাটার্জী, ১০ম সং
জ্বর চিকিৎসার সার-সংগ্রহ—ডাঃ জে এম মিত্র, ৫ম সং
অর্গানন অফ মেডিসিন—ডাঃ ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোঃ, ২য় সং
ঔষধ পরিচয় বা মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ম সং
ধাতু-দৌর্বল্য—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৯ম সং
ঋতু-সম্বন্ধীয় পীড়া—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৭ম সং
বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটেরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি কে বসু, ১৪শ সং
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ও মাত্রা—ডাঃ বি কে বসু, ৮ম সং
মানসিক লক্ষণের মেটেরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি কে বসু, ৪র্থ সং
হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গ—ডাঃ বি কে সরকার .
রক্ত ও রক্ত পরীক্ষা—ডাঃ বি বি সেন, ৮ম সং
মূত্র পরীক্ষা—ডাঃ বি বি সেন, ১০ম সং
পকেট মেটেরিয়া মেডিকা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৮ম সং
নোসোড্স—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৭ম সং
ডায়েরিয়া—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সং
গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৭ম সং

আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সং
ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৪র্থ সং
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সং
পকেট গেরাপিউটিক্স—ডাঃ আর বিশ্বাস, ৪র্থ সং
রোগীচিত্র ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—ডাঃ মনোরঞ্জন নন্দী
হোমিও গীতা—ডাঃ সতীভূষণ ভট্টাচার্য, ৩য় সং
হোমিওপ্যাথিক গো-চিকিৎসা—ডাঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল, ৬ষ্ঠ সং
ব্যাধির সাংঘাতিক ও চরম অবস্থায় হোমিওপ্যাথি—ডাঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল, ২য় সং

সরল পারিবারিক চিকিৎসা—১১শ সং
সংক্ষিপ্ত সরল পরিবারিক চিকিৎসা—৭ম সং

LIST OF OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Therapeutics of Fevers—Dr. H. C. Allen, M.D., 2nd Ed,
Homœopathic Therapeutics of Diarrhœa—Dr. J. B. Bell, 2nd Ed.
What Is a Homœopathic Dilution and How Homœopathic Medicine Acts—Dr. A. Berne, 5th Ed.
Homœopathic Treatment of Asthma—Dr. Fortier Bernoville, 7th Ed.
What Shall Be Our Attitude Towards Homœopathy—Dr. August Bier.
Life of Dr. Mahendra Lal Sircar, M.D., D. L., C.I.E.—Dr. S. C. Ghose, 2nd Ed.
Drugs of Hindoosthan—Dr. S. C. Ghose, 7th Ed.
Studies in Organon—Dr. L. Gomes, M.A., B.T., D.M.S.
Dr. W. Younan's Therapeutic Hints—Dr. K. D. Goswami, 7th Ed.
Selected Help in Children's Diseases—Dr. W. Karo, 6th Ed.
Homœopathy in Women's Diseases—Dr. W. Karo, 6th Ed.
Diseases of the Male Genital Organs—Dr. W. Karo, 5th Ed.
Diseases of the Skin—Dr. W. Karo, 5th Ed.
Rheumatism—Dr. W. Karo, 4th Ed.
Urinary and Prostatic Troubles—Dr. W. Karo, 4th Ed.

Diseases of the Respiratory System—Dr. W. Karo, 3rd Ed.
Repertory of the Homœopathic Materia Medica—
Dr. J. T. Kent, M. D., 2nd 'Hapco' 2nd Ed.
Dr. Mahendra Lal Sircar's Therapeutic Hints
Dr. A. N. Mukherjee, 6th Ed.
Essays on Homœopathy—Dr. B. K. Sarkar.
Manual for the Biochemical Treatment of Diseases (An Abridged Therapy)—Dr. M. Schuessler, 2nd Ed.
Difficult and Backward Children—Dr. Leon Vannier, 5th Ed.
Fifty Millesimal Potencies—A collection of articles on the subject by famous authors.

LIST OF OUR HINDI PUBLICATIONS

Biochemic Comparative Materia Medica & Therapeutics —Dr. B. K. Bose, 5th Ed.
Bhesaj Ratnakar—Dr. E. B. Nash, (Translation of "Leaders in Homœopathic Therapeutics"), 6th Ed.
Bharatiya Aushadhabali—Dr. K. N. Basu. 7th Ed.
Comparative Materia Medica—Dr. N. C. Ghose, 14th Ed.
Practitioners' Guide, Parts I, II & III—Dr. N. C. Ghose, 10th Ed.
Dhatu Dourballya—P. C. Bhar, 7th Ed.
Ritu Sambandhiya Peera—P. C. Bhar, 4th Ed.
Saral Biochemic Chikitsa—Dr. R. K. Mukherjee, 10th Ed.
Sishuroga Chikitsa—Dr. S. M. Bhar, 4th Ed.
Saral Paribarik Chikitsa—6th Ed.
Sankshipta Saral Paribarik Chikitsa—7th Ed.
Homœopathic Go-Chikitsa—Dr. S. K. Mondal.
Physiology—Dr. J. Chatterjee.

Publishers :
HAHNEMANN PUBLISHING CO. PRIVATE LTD.
165 Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta—700012